গল্পে হযরত আলী (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত আলী (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত আলী (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত আলী (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশনায়	:	নার্গিস মুনিরা, শিশু কানন ৩২০ উলন রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা ফোন : ০১৭১০-৩৩০৪৩০
প্রকাশকাল	:	জুলাই ২০১১
শব্দবিন্যাস	:	ডিজাইনবাজার, ঢাকা ফোন : ৭১৭১৯৭৫
মুদ্রণ	:	সফিক প্রেস বাংলাবাজার, ঢাকা ফোন : ৭১১৩২৬২
প্রচ্ছদ	:	মুবাশ্বির মজুমদার
অলঙ্করণ	:	আজিজুর রহমান
মূল্য	:	৭০.০০ টাকা

The Story of Hazrat Ali (R)

By Iqbal Kabir Mohon
Published by Nargis Munira, Shishu Kanon
Price : Taka 70.00
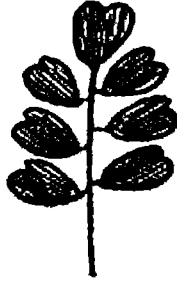
কুরআন শরীফের এমন কোনো আয়াত
নেই, যা নাযিল হওয়ার কারণ ও এর
তারতীব আমার জানা নাই।
– হযরত আলী (রা)

অর্থ সম্পদে ধনী ব্যক্তি প্রকৃত ধনী নহে,
বরং সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ধনী যার হৃদয়
ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ।
– হযরত আলী (রা)
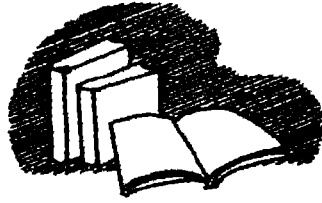
শিশু-কিশোরদের জন্য
লেখকের বই

১. ছোটদের মহানবী (সা)। ২. সেরা মানুষের জীবনকথা। ৩. এক বেদুইনের গল্প। ৪. এসো জীবন গড়ি। ৫. গল্পে হযরত আবু বকর (রা) ৬. গল্পে হযরত উমর (রা)। ৭. গল্পে হযরত উসমান (রা)। ৮. গল্পে হযরত আলী (রা)। ৯. আলোর পাখিরা। ১০. ন্যায়বিচারের কাহিনী শোন। ১১. সাহাবীদের গল্প শোন। ১২. সোনালী দিনের কাহিনী শোন। ১৩. গল্প পড়ো জীবন গড়ো। ১৪. সেনাপতি হলেন সৈনিক। ১৫. সত্যের হলো জয়। ১৬. কে আমীর কে ফকির। ১৭. আমার আল-কুরআনের বন্ধুরা। ১৮. মহানবী (সা)-এর শিশুবেলা। ১৯. এক সাহসী বালক। ২০. কাবাঘর তৈরির কাহিনী। ২১. রানী ও পাখি। ২২. হযরত আদম (আ)-এর কাহিনী শুনি। ২৩. হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনী শুনি। ২৪. হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর কাহিনী শুনি। ২৫. হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী শুনি। ২৬. হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাহিনী শুনি। ২৭. ছোটদের আল-কুরআনের মানুষ। ২৮. অপু ও কাকের গল্প। ২৯. কারুনের ধন। ৩০. হাবিল ও কাবিলের কাহিনী শোন। ৩১. জমজম কূপের কাহিনী শোন। ৩২. ছোটদের ইসলামী শিক্ষা-এক। ৩৩. ছোটদের ইসলামী শিক্ষা-দুই। ৩৪. ছোটদের ইসলামী শিক্ষা-তিন। ৩৫. ছোটদের ইসলামী শিক্ষা-চার। ৩৬. ছোটদের ইসলামী শিক্ষা-পাঁচ।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র সার্বজনীন জীবনবিধান। দুনিয়ার সেরা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এই শ্রেষ্ঠ বিধানকে দুনিয়ায় সফলভাবে কায়েম করে গেছেন। এ জন্য তাঁকে অনেক অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে।

মহানবী (সা)-এর প্রিয় সাহাবীরাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কম চেষ্টা-তদ্বির করেননি। তাঁদের সবার চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই মহানবী (সা)-এর সাহাবীরাও সকলের কাছে সমাদৃত ও সম্মানিত। এসব সাহাবীর মধ্যে ইসলামের চার খলিফা ছিলেন অন্যতম। তাঁদের বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং গুণাবলি এখনও আমাদের মধ্যে বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগায়। তাই এ চারজন বিশিষ্ট খলিফার জীবন ও চরিত্রকে আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন।

আজকের দুনিয়ার চরম নৈতিক অধঃপতনের যুগে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের নানা দিক যেমন আলোচনা করা প্রয়োজন, পাশাপাশি চার খলিফার জীবনকেও অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের শিশু-কিশোরদের সামনে তাঁদের চরিত্রমাধুর্যের চিত্র তুলে ধরা জরুরি। এতে আমাদের শিশু-কিশোররা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং এই শিক্ষার আলোকে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে।

'গল্পে হযরত আলী (রা)' বইটিতে ইসলামের চতুর্থ খলিফার জীবনের সামান্য কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি মনে করি, আমাদের সোনামণি শিশু-কিশোররা বইটি পড়ে আমাদের প্রিয় এই খলিফার জীবন ও চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। এতে তাদের জীবন হবে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও পবিত্র।

আমি আশা করি, আমাদের ছেলেমেয়েরা এই বইয়ের মাধ্যমে অনেক উপকৃত হবে। বড়রাও এ বই থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহতাআলা আমাদের এ নগণ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

ইকবাল কবীর মোহন

ফোন : ০১৭১৩-২২৯৯২৫

গল্পে হযরত আলী (রা)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত আলী (রা) এক মহান বীরের নাম। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা। আমরা সবাই এ মহাপুরুষের নাম কম বেশি জানি। হযরত আলী (রা) রাসূলে করীম (সা)-এর জামাতা ছিলেন।

মহানবী (সা)-এর নবুয়তের মাত্র দশ বছর আগের কথা। ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ। সেই সময় এক শুভক্ষণে আলী (রা) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মক্কার বিখ্যাত হাশেমী গোত্রে তাঁর জন্ম হয়।
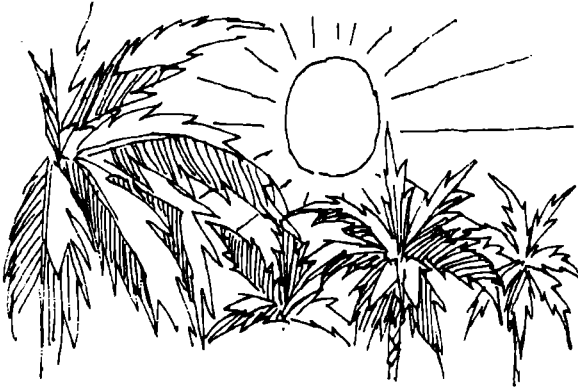
আলী (রা)-এর পিতার নাম আবু তালিব ও মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশিম। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা ছিলেন আবু তালিব। তিনি ছিলেন অতিশয় দরিদ্র। তার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। তাই বালক আলীর দুঃখের শেষ ছিল না। তবে আলী (রা) চাচাত ভাই মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারের সাথে থেকে বড় হয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)ও হযরত আলীকে অতিশয় পছন্দ করতেন। তাই তিনি তাঁকে সবসময় সাথে সাথে রাখতেন।

জন্মের পর মা-বাবা আলী (রা)-এর নাম রাখলেন 'আবুল হাসান'। তবে সবাই তাঁকে আলী নামেই ডাকতেন। তাঁকে 'আবু তুরাব' নামেও ডাকা

হতো। তবে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আলী ইবনে আবি তালিব। পরিণত বয়সে আলী (রা)-এর নামের সাথে বিভিন্ন উপাধি এসে যুক্ত হলো। তাঁর মধ্যে তিনটি উপাধি ছিল প্রধান। উপাধিগুলো হলো, 'আসাদুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর বিজয়ী সিংহ, 'হায়দার' মানে প্রচণ্ড আক্রমণকারী সিংহ এবং 'মুরতাজা' অর্থ আল্লাহ যার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। তাঁকে 'শেরে খোদা' বা আল্লাহর বাঘ বলেও ডাকা হতো। আলী (রা) তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং অসামান্য গুণাবলির কারণে এসব উপাধি লাভ করেছিলেন।

আলী (রা) ছিলেন আল্লাহর নবী (সা)-এর ঘনিষ্টজনদের একজন। তাই তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্যতম। তাই নবীজীর চরিত্রের সকল শুভ প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের অভাবিত পরশ পেয়ে তিনি পরিণত হন অসামান্য এক মহামানবে। আল্লাহর নবী (সা)-এর কাছ থেকে তিনি যাবতীয় ইসলামী শিক্ষা অর্জন করেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ওপর তাঁর দখল ছিল অসামান্য। ঐশী কালাম কুরআনের ওপর প্রখর জ্ঞান তখন আলী (রা) ছাড়া আর দ্বিতীয় কারো ছিল না। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আলেম। তাই তাঁর জ্ঞান-গরিমার খবর সর্বত্র আলোচিত হতো। আলী (রা)-এর অসীম জ্ঞান মহানবী (সা)-কেও আকৃষ্ট করেছিল। এ কারণে মহানবী (সা) আলী (রা) সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার দরজা।' মহানবী (সা)-এর একথা পরবর্তীকালে যথার্থ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত আলী (রা)-এর পিতা ও মাতার নাম কী?

২. আলী (রা) কত সালে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

৩. আলী (রা)-এর নাম কী রাখা হয়েছিল?

৪. আলী (রা)-এর উপাধিগুলো কী কী?

আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

মহানবী (সা) নবুয়ত পেলেন। ইসলাম প্রচারের কাজে মনোনিবেশ করতে তাঁর ওপর আল্লাহর নির্দেশ জারি হলো। মহান প্রভুর আদেশ পেয়ে মহানবী (সা) ধীরে ধীরে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করলেন। প্রথমদিকে খুব কম লোকই ইসলাম কবুল করেছিল। নবী (সা)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মাত্র গুটিকতেক লোক মুসলমান হলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত খাদিজা (রা), হযরত আবু বকর (রা) প্রমুখ।
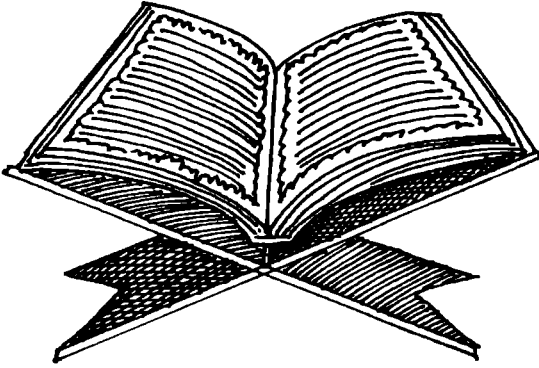
তাঁরা সবাই ছিলেন পূর্ণ বয়স্ক ও সমঝদার মানুষ। সবচেয়ে কম বয়সের বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছিলেন। এ সময় মক্কা নগরীর অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। অধিকাংশ মানুষ ছিল মুর্খ ও অবিশ্বাসী। তারা মূর্তিপূজা করত এবং নানা অপকর্মে লিপ্ত থাকত। তাই মক্কার পরিবেশ মুসলমানদের জন্য বেশ প্রতিকুলে ছিল।

কেউ ইসলাম কবুল করলেই তাদের ওপর নেমে আসত জুলুম ও নিপীড়ন। নিজ আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনের কাছ থেকেও বাধা আসত। আলী

(রা)-এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না। ইসলাম কবুল করার পর তাঁর সামনেও আসল অনেক বাধা ও বিপত্তি। তাঁর আত্নীয়রা প্রথমে তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়াল। সমাজের পক্ষ থেকেও আসল অনেক ভয়-ভীতি ও হুমকি-ধমকি। তবে তিনি ইসলামের খাতিরে সব বাধা সাহসের সাথে কাটিয়ে উঠলেন। অসীম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করলেন সব ধরনের জুলুম ও অত্যাচার। কোনো কোনো সময় জীবনের ঝুঁকির মধ্যেও পড়েছিলেন আলী (রা)। তবুও তিনি ক্ষণিকের জন্য ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

একদিনের এক মজার ঘটনা। সেদিন আলী (রা) দেখলেন যে, মহানবী (সা) ও তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) গভীর মনোযোগ সহকারে নামায পড়ছেন। তিনি দেখলেন, তাঁরা দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নিচে নামাচ্ছেন এবং তারপর দু'হাত পেটের ওপর এনে রাখছেন। এরপর তারা কি যেন পড়লেন। তাঁরা হাত ছেড়ে দিয়ে বাঁকা হয়ে হাঁটুতে ধরছেন অর্থাৎ রুকু করছেন। আবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন। আবার সোজা হয়ে বসছেন। বসেই তাঁরা মাটিতে মাথা নুইয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ সিজদা করছেন। তারপর নিয়মমতো উঠে দাঁড়াচ্ছেন অথবা বৈঠকে বসে কি যেন পড়ছেন। এভাবে অনেকক্ষণ যাবৎ তাঁরা নামায পড়লেন।

এ ঘটনা দেখে বালক আলী (রা) অবাক হলেন। এতে তাঁর মনে এ নিয়ে কৌতুহল জাগল। তিনি মহানবী (সা) ও খাদিজা (রা)-এর এসব কাজকে ভালোভাবে দেখলেন আর খানিকক্ষণ এটা নিয়ে ভাবলেন। তাঁর মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হলো। তবে এর কোনো সমাধান মিলল না। তাই আলী (রা) মুহাম্মদ (সা)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

আলী (রা) বললেন, 'নবীজি, আপনারা কি করছিলেন? যা পড়ছিলেন তা জানতে পারি কি?' মহানবী (সা) জবাবে বললেন, 'শোন, আলী! আমরা এমন এক আল্লাহর ধর্ম পালন করছিলাম– যিনি দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। আমরা তাঁকে সিজদা করছিলাম অর্থাৎ নামায পড়ছিলাম। আর শোন, তোমাকেও বলি, তুমিও এ ধর্ম গ্রহণ করে নাও এবং মহান আল্লাহতাআলার ইবাদাত করো। এটাই আল্লাহর ধর্ম। আর এ ধর্মই আমাদের সবার মেনে চলতে হবে।'

আলী (রা) তখন ছোট্ট বালক। বয়স মাত্র আট বছর। এ বয়সে অনেক কিছুই বুঝবার কথা নয়। তবে আল্লাহর কী শান! আলী (রা) ছোট্ট বালক

হলে কী হবে? তিনি মহানবী (সা)-এর কথার মর্ম অনায়াসেই বুঝতে পারলেন। মহানবী (সা)-এর কথা ও কাজ তাঁর মনঃপূত হলো। তাই তিনি আর দেরি করলেন না। আলী (রা) মহানবী (সা)-কে বললেন, 'আমি প্রস্তুত আছি। বলুন, কী করতে হবে আমাকে?'

বালক আলী (রা)-এর কথা শুনে মহানবী (সা) খুব খুশি হলেন। আলী (রা)-এর আগ্রহ দেখে তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল। কালবিলম্ব না করে মহানবী (সা) আলী (রা)-কে কালেমা পড়িয়ে দিলেন। এভাবে আলী (রা) ইসলাম কবুল করে মুসলমান হলেন। এটি ৬০৮ সালের ঘটনা।

আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিব ছিলেন বিধর্মী। অবিশ্বাসী হলে কী হবে? তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র ও সমঝদার মানুষ। পুত্র আলী ইসলাম গ্রহণ করেছেন–এ খবর সহসাই পিতার কানে গিয়ে উঠল। কিন্তু এতে তিনি কোনো রা করলেন না। এ জন্য পুত্রকে কোনো বাধাও দিলেন না, বরং তিনি আলী (রা)-কে ডেকে বললেন, 'হে বৎস! তুমি এ ধর্মেই থেকে যাও। আমি জানি, মুহাম্মদ (সা) তোমাকে বিপথে চালিত করবে না। সে তো ভালো মানুষ, সে খাঁটি বিশ্বাসী। তাই তোমার কোনো ভয় নেই।'

ব ল তে পা রো ?

১. আলী (রা) কত সালে ইসলাম কবুল করেন?

২. তাঁর বয়স তখন কত ছিল?

৩. আলী (রা) মহানবী (সা) ও খাদিজাকে কী পড়তে দেখলেন?

৪. পুত্রের ব্যাপারে আবু তালিবের মনোভাব কেমন ছিল?

আলী (রা) খলিফা হলেন

আলী (রা) যখন ইসলাম কবুল করলেন তখন আরবের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ভালো ছিল না। চারদিকে হানাহানি ও বিবাদ লেগেই থাকত। আরব সমাজ ছিল ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। নানা প্রকার কুসংস্কার ও নীতিহীনতা আরবে শিকড় গেড়ে বসেছিল। ইসলামের শত্রুরা সর্বত্র হায়েনার মতো ঘুরে বেড়াত। ইসলামের নাম শুনলেই শত্রুরা কান খাড়া করত। ইসলামকে শেষ করার জন্য কাফের-মুশরেকরা সবসময় নানা পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তাই গোপনে গোপনে চলছিল ইসলামের কাজ।
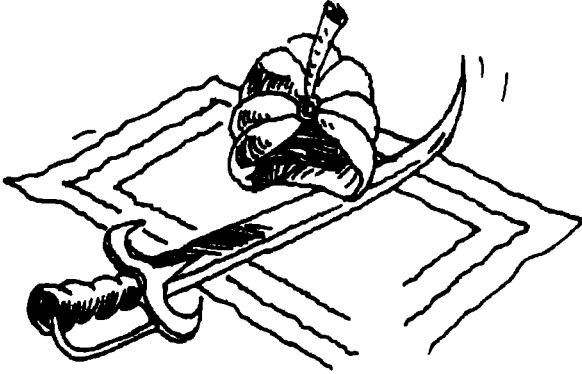
ইতোমধ্যে হযরত আলী (রা) ইসলাম কবুল করলেন। মুসলমান হয়ে তিনি আর বসে থাকলেন না। নেমে পড়লেন ইসলাম প্রচারের কাজে। বেশ গোপনে শুরু করলেন ইসলাম প্রচারের কাজ। মহানবী (সা)ও সে সময় গোপনে মানুষকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। রাসুল (সা)-এর এ কাজে আলী (রা) ছিলেন নিত্যসঙ্গী। দিনরাত ফুরসৎ নেই। এখন কাজ একটাই। মানুষকে আল্লাহর দীনের পথে ডাকা।

আলী (রা)-এর পিতা ছিলেন আবু তালিব। তিনি মহানবী (সা)-এর চাচা। কিন্তু তিনি মুসলমান হননি। তারপরও প্রিয়সন্তান আলী (রা)-কে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে বাধা দেননি, বরং পুত্রকে আবু তালিব ইসলামের প্রচারের কাজে সমর্থন দিয়ে গেছেন।

মহানবী (সা)-কেও সমর্থন দিতেন চাচা আবু তালিব। মহানবী (সা) যতগুলো জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন তার প্রায় সবগুলোতেই হযরত আলী (রা) অংশ নেন। প্রতিটি জিহাদে তিনি নিষ্ঠা ও সততার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। আলী (রা)-এর ছিল অসীম সাহস ও প্রচণ্ড মনোবল। তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ফলে দেশ-বিদেশে মহাবীর আলী (রা)-এর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই শত্রুরা আলী (রা)-এর বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পর্কে প্রচণ্ড ভীত ছিল।

আলী (রা) শুধু একজন বীরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। যোগ্যতা ও দক্ষতায় তাঁর সমকক্ষ লোক আরবে তখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। যুদ্ধ পরিচালনার সাথে সাথে প্রশাসনিক কাজেও তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতা ছিল।

তাই খলিফা আবু বকর ও উমর (রা) তাঁদের শাসনামলে আলী (রা)-কে রাষ্ট্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আবু বকর ও উমর (রা)-এর সময়কালে তিনি কখনও ইসলামী খেলাফতের মন্ত্রী, কখনওবা উপদেষ্টার দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন। আলী (রা) তৃতীয় খলিফা উসমান (রা)-এর আমলেও তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন।

দেখতে দেখতে হযরত উসমান (রা)-এর খেলাফতকালের পরিসমাপ্তি ঘটল। উসমান (রা) ৩৫ হিজরী সালে ইন্তেকাল করলেন। এ সময় খেলাফতের দায়িত্বভার নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হলো। কেননা, হযরত উসমান (রা) নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার পর দেশে বেশ অস্থিরতা চলছিল। কিভাবে এ পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে তা নিয়ে সাহাবীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। সবাই ভাবলেন একজন যোগ্য নেতার ওপরই কেবল খলিফার দায়িত্বভার দেয়া উচিত। এ জন্য আলী (রা)-এর নাম ঘুরেফিরে সবার মধ্যে আলোচিত হচ্ছিল।

অবশেষে সবাই মিলে আলী (রা)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করলেন। সাহাবীরা জানতেন, আলী (রা)-এর মতো যোগ্য ও সাহসী লোক ছাড়া

পরিস্থিতি সামাল দেয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, তিনি ছিলেন যেমন দক্ষ, তেমনি বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। প্রশাসক হিসেবে আগে থেকেই তাঁর ওপর সবার আস্থা ছিল। বাস্তবেও দেখা গেল তাই।

হযরত আলী (রা) খলিফা হওয়ার পর দেশে অস্থিরতা বেশ অনেকটা কমে এলো। তিনি দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে সব সমস্যা কাটিয়ে উঠলেন এবং ইসলামী খেলাফতকে সুসংহত করলেন।

হযরত আলী (রা) ছিলেন একজন আপসহীন ও ন্যায়বান খলিফা।

ব ল তে পা রো ?

১. আলী (রা) কত সালে খলিফা নির্বাচিত হন?

২. উসমান (রা)-এর আমলে আলী (রা) কী দায়িত্ব পালন করেন?

৩. হযরত আলী (রা) কেমন খলিফা ছিলেন?

ন্যায়বান খলিফা আলী (রা)

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আলী (রা)-এর সামনে সমস্যার পাহাড় এসে দাঁড়াল। সব সমস্যাই তিনি একে একে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন। সাথে সাথে দীনের কাজেও মনোযোগী হলেন। তাঁর মনে ইসলামের কাজ সারাক্ষণ জেগে থাকত। কিভাবে ইসলামকে অবিশ্বাসী ও পথহারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়– এটাই ছিল তাঁর কল্পনা। তিনি সবসময় ইসলাম প্রচারের পথ ও পন্থা নিয়ে ভাবতেন।
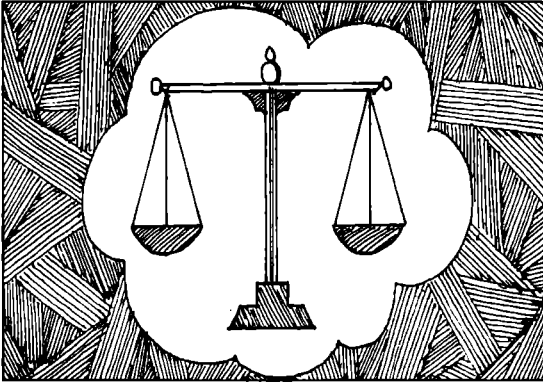
তখনকার আরব সমাজ ছিল নানা ধরনের অন্যায়-অবিচার ও পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ। সমাজের মানুষের অসত্য ও অন্যায় আচরণ হযরত আলী (রা)-এর মনকে পীড়া দিতো। মাঝে মাঝে তিনি প্রচণ্ড হতাশায় মুষড়ে পড়তেন। তবে সমস্যার কারণে তিনি কখনও থেমে যাননি। সমাজের সব অসঙ্গতি ও খারাবি দূর করতে তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন।
খেলাফতের পবিত্র দায়িত্ব পেয়ে আলী (রা)-এর সামনে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। তিনি এই সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগালেন। এ সময় রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজকর্ম ন্যায় ও সততার সাথে পালন করেন তিনি। ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ আলী (রা)-এর কাজকর্মে মহাখুশি।

খেলাফতের দায়িত্বভার পালনকালের এক চমকপ্রদ ঘটনা। একদা এক খ্রিষ্টান লোক খলিফা আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করল। লোকটি কাজির আদালতে গিয়ে খলিফার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলো।

মামলার আবেদন পেয়ে কাজি সাহেব বিচারের শুনানির জন্য দিনক্ষণ ঠিক করলেন। নিয়ম মোতাবেক আদালতে হাজির হওয়ার জন্য খলিফার ওপর সমন জারি করা হলো। ইসলামী রাষ্ট্রের কাজি বলে কথা। তারা ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, আপসহীন ও নীতিবান মানুষ। বিচারের বেলায় তাঁরা কখনও উচুঁ-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। রাষ্ট্রের খলিফার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাতে কী? কাজি সাহেব এ জন্য মোটেও বিচলিত হলেন না, বরং মামলার নিয়ম মতো কাজি সাহেব খলিফাকে শশরীরে আদালতে এসে হাজির হতে নির্দেশ দিলেন।

হযরত আলী (রা)ও খলিফা হলে কী হবে? তিনি আদালতের নির্দেশ শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিলেন। বিচারের দিন তিনি সময় মতো আদালতে গিয়ে হাজির হলেন। কাজির এজলাসের সামনে এসে যথারীতি দাঁড়িয়েছেন আলী (রা)। শত হলেও তো বিশাল সাম্রাজ্যের খলিফা। রাষ্ট্রের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি তিনি। তা ছাড়া আদালতের কাজি খলিফারই নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। তাই কাজি সাহেব মহামতি খলিফাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লজ্জাবোধ করলেন। তিনি খলিফাকে সম্মান দেখাতে গিয়ে খলিফার সেবায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

খলিফার খেদমত করতে গিয়ে কাজি সাহেব কি করবেন না করবেন তার কুল-কিনারা করতে পারলেন না। খলিফা দেখলেন, কাজি সাহেব তাড়াহুড়ো করে খলিফার বসার জন্য একটি চেয়ার খুঁজে এনেছেন। তিনি এরপর খলিফাকে চেয়ারে বসার জন্য অনুরোধ করলেন। কাজি সাহেবের এ ব্যতিব্যস্ততা খলিফার নজর এড়াল না। এতে তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। বিষয়টি তিনি কাজি সাহেবের দৃষ্টিতে আনলেন।

হযরত আলী (রা) কাজি সাহেবকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাজি সাহেব, শুনুন! আপনি আমার জন্য অত ব্যতিব্যস্ত হবেন না। জেনে রাখুন, আমি এখন আর আপনাদের খলিফা নই। আমি এক মামলার আসামি। একজন সাধারণ বাদি হয়েই আমি আপনার আদালতে হাজিরা দিতে এসেছি। আইনের চোখে আমি অন্য বাদির মতোই একজন। তাই সাধারণ বাদিরা

আপনার কাছ থেকে যা আচরণ পায় আমিও সে রকম আচরণই আশা করি। আর আমি সেটা পাবারই যোগ্য। আপনি বরং আপনার দায়িত্ব পালন করুন। মামলার কাজ স্বাধীনভাবে পরিচালনা করুন।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাজি সাহেব খলিফাকে নিয়ে অনেকটা ভয়ের মধ্যে ছিলেন। কারণ, স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে মামলার বিচার কাজ পরিচালনা করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তবে খলিফার কাছ থেকে অভয় পেয়ে কাজি সাহেব আশ্বস্ত হলেন। তার মনে খানিকটা সাহস ফিরে এলো। এরপরই কাজি সাহেব নির্ভয়ে মামলার কাজ শুরু করে দিলেন।

কাজি সাহেব বাদি-বিবাদি উভয়পক্ষের সব বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। দু'জনের জবানবন্দী রেকর্ড করলেন তিনি। জবানবন্দী নেয়া শেষ হলে কাজি সাহেব তাদের বক্তব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন। আদালত জুড়ে তখন পিনপতন নীরবতা। স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে মামলা। তাই কাজি সাহেবের রায় শোনার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। এদিকে কাজি সাহেব অনেক ভেবেচিন্তে তার বহু প্রতীক্ষিত রায় ঘোষণা করলেন।

তবে রায় গেলে মুসলিম জাহানের খলিফা আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে। কাজির এ রায় শুনে বিবাদি খুশিতে টগবগ করে উঠল। তার চোখেমুখে বিজয়ের তৃপ্তি। মনে সীমাহীন আনন্দ। তার ঠোঁটে যেন একরাশ বিজয়ের ঝিলিক খেলে গেল। ওদিকে ঘটল মজার এক কাণ্ড। কাজির রায় শুনে খলিফার মধ্যে হতাশার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। তাঁকে মোটেও অসন্তুষ্ট মনে হলো না, বরং ন্যায়বান কাজির নিরপেক্ষ রায় শোনার পর খলিফা যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি এই রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

বিবাদি খ্রিষ্টান লোকটি ছিল বেশ চালাক। সে রায়ের আগে ও পরে মহামতি খলিফার প্রতিক্রিয়া ও আচার-আচরণ গভীর মনোযোগ দিয়ে অবলোকন করছিল। খলিফা হয়েও তিনি আদালতের রায় সহাস্যে মেনে নেয়ার পর লোকটির মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো।

লোকটি দেখতে পেল, কিভাবে একজন খলিফা ন্যায়বিচারের প্রতি সম্মানবোধ দেখালেন। খলিফার বেতনভুক্ত একজন কাজি হয়েও দেশের খলিফাকে পর্যন্ত শাস্তি দিতে তিনি পিছপা হলেন না। অন্যদিকে খলিফাও রায়ে পরাজিত হয়ে অখুশি হলেন না, বরং তিনি খুশিই হলেন।

খলিফার এ অসাধারণ আচরণ দেখে খ্রিষ্টান লোকটি অভিভূত হলো। সে সচক্ষে দেখতে পেল ইসলামের আসল সৌন্দর্য। মহান ধর্ম ইসলামের মাহাত্ম্য কাছ থেকে দেখে খ্রিষ্টান লোকটির বিস্ময় যেন কাটে না। এতে লোকটির মধ্যে এ বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য লজ্জাবোধেরও জন্ম নিলো।

এতদিন ধরে ইসলামের প্রতি খ্রিষ্টান লোকটির মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, আজ এক নিমিষেই তার অবসান ঘটল। শুধু তাই নয়। মহামতি কাজির সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা খ্রিষ্টান লোকটির মনোজগতে এক অসাধারণ তোলপাড় সৃষ্টি করল। মহান সত্যের কাছে তার মাথা যেন অবনত হয়ে আসল।

খ্রিষ্টান লোকটি আর স্থির থাকতে পারল না। মহাসত্যের আলোর বিচ্ছুরণ খ্রিষ্টান লোকটির দেহমনে অসম্ভব আলোড়ন তৈরি করল। তাই সে খলিফার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। সে ভাবছিল, অযথা সে একজন বিশিষ্ট ন্যায়পরায়ণ মানুষকে অপমানিত করেছে। লোকটি মনে মনে ঠিক করল, এ অমার্জনীয় অপরাধের জন্য সে খলিফার কাছে মাফ চাইবে। কিন্তু এটা নিয়ে তার মনে খুব ভয় কাজ করছিল। কিভাবে সে গিয়ে খলিফার কাছে মাফ চাইবে এবং তার মনের কথা বলবে তা নিয়ে লোকটার মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হলো।

তবে কী আর করা। তার যে আর সহ্য হচ্ছে না। খলিফার কাছে মাফ চাওয়া না হলে তার অস্থিরতা যে কমবে না। তাই লোকটি ভয়ে ভয়ে গিয়ে খলিফাকে বলল, 'হে প্রিয় খলিফা! আপনি বড় মহান। আপনার সাথে আমার অনেক ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার প্রতি জুলুম করেছি। আপনার মতো মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে আমি মহা অন্যায় ও পাপ করেছি। আমার এ ভুলের জন্য আমি আজ খুবই ব্যথিত ও লজ্জিত, আমাকে মাফ করুন।'

লোকটি আরও বলল, 'আজ কাজির বিচারের রায় এবং আপনার অভাবিত আচরণ আমাকে অভিভুত করেছে। ইসলামের ন্যায়বিচার ও নীতিবোধ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। তাই এ মহান ধর্ম সম্পর্কে আমার যাবতীয় ভুল ধারণা দূর হয়ে গেছে। আমি এখন বুঝতে পারছি ইসলামই একমাত্র সত্যিকারের ধর্ম। এ ধর্ম আমি গ্রহণ করতে চাই, আমি মুসলমান হতে চাই। আমাকে মুসলমান করে নিন।'

খলিফা লোকটির কথা শুনে যারপরনাই খুশি হলেন। খলিফার বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে খ্রিষ্টান লোকটির জীবনের মোড় এভাবেই ঘুরে গেল। শেষমেশ লোকটি সত্য ধর্মের প্রতি ঈমান আনল। ন্যায়বান খলিফার মহানুভবতায় একজন লোক খ্রিষ্টান হয়েও ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করল।

হয়রত আলী (রা)-এর মতো ন্যায়বান খলিফা বা রাষ্ট্রনায়ক আজকাল আমরা একজনও খুঁজে পাইনা।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত আলী (রা) কেমন খলিফা ছিলেন?

২. একবার কে খলিফার বিরুদ্ধে মামলা করে বসল?

৩. আলী (রা) মামলার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিলেন?

৪. খলিফা আদালতে হাজির হলে কাজি সাহেব কী করলেন?

৫. বিচারের রায় কার বিরুদ্ধে গেল?

৬. খ্রিষ্টান লোকটি পরিশেষে কী করল?

দীনহীন এক খলিফা

ইসলাম স্বাভাবিক ও আড়ম্বরহীন এক ঐশী ধর্ম। ইসলামে জাঁকজমক ও ভোগ বিলাসের মোটেও স্থান নেই। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মুসলমানদের জন্য এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। তাঁর সাহাবারাও ছিলেন এ মহান শিক্ষায় দীক্ষিত।

ফলে সাহাবারাও বেশ দীনহীনভাবে জীবন পরিচালনা করতেন। খলিফারা প্রায় সবাই ছিলেন দীনহীন ও অভাবি। বিশাল সাম্রাজ্য ও অঢেল সম্পদ হাতের নাগালের মধ্যে থাকলেও তাঁরা এসব নিয়ে মোটেও ভাবতেন না।

কেননা, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকের প্রতি তাদের আদৌ আকর্ষণ ছিল না। দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও অর্থকে তাঁরা সর্বদা এড়িয়ে চলতেন। তাই তাঁদের জীবনযাপন প্রণালী ছিল অতিশয় সাধারণ।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)। তিনিও ছিলেন একই ধরনের মানুষ। আলী (রা) মুসলিম জাহানের অধিপতি হয়েছেন। বলতে গেলে গোটা দেশের কর্ণধার তিনি। রাজ্যের কোষাগারের একচ্ছত্র মালিক খলিফা। অথচ তাঁর না ছিল কোনো দারোয়ান, না ছিল দাসদাসী। এককথায়, তাঁর নিজের সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না।

একদা ঘটল এক মজার ঘটনা। বছর ঘুরে মুসলমানদের ঘরে এলো ঈদের আনন্দ। স্বভাবতই চারদিকে চলছিল আনন্দ উৎসব। ঘরে ঘরে নতুন নতুন খাবারের আয়োজনও কম ছিল না। সে দিনের এক ঘটনা এটি।

ঈদের এই আনন্দের দিনে হযরত যুবাইর (রা) আলী (রা)-এর সাথে খেতে বসেছেন। তাঁদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো। ঈদের দিনের খাবার, স্বাভাবিকভাবেই ভালো খাবার তৈরি হবার কথা। যুবাইর (রা) আজ এ ধরনের খাবারের আশাই করছিলেন।

অথচ তাদের সামনে যা পরিবেশিত করা হলো, তা ছিল অন্যান্য দিনের মতোই অতি সাধারণ। খাবারের ম্যানুতে কোরমা পোলাও বা ফিরনির নাম গন্ধ নেই। অন্যদিনের মতো আজও সাধারণ রান্না করা হয়েছে।

এসব খাবার দেখে হযরত যুবাইর (রা) বললেন, 'ভাইসাব! আজ মহান খুশির ঈদ। চারদিকে খাবারের উৎসব আমেজ। ভাবছিলাম ঈদের দিনে আপনার সাথে ভালো খাবার খাব। অথচ আজও দেখছি অতি সাধারণ খাবার।'

খলিফা আলী (রা) যুবাইর (রা)-এর মুখের দিকে তাকালেন এবং তারপর বললেন, 'শোন যুবাইর ! তুমি তো সবকিছুই জানো। কোনো জাঁকজমক আমি পছন্দ করি না। দীনহীনভাবে জীবন কাটাতেই আমি ভালোবাসি। আমি অতি সাধারণভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কাজ চালাতে চাই। জাঁকজমক বা শান-শওকতের আমাদের কি প্রয়োজন আছে বলো?'

হযরত আলী (রা)-এর খাবার দাবার যেমন ছিল সাধারণ, তাঁর পোশাক পরিচ্ছদও ছিল অতিশয় সাদাসিধে। তিনি প্রায়শই তালি দেয়া জামা কাপড় পরিধান করতেন। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদে বাদশাহির নাম গন্ধও ছিল না।

একদিনের এক মজার ঘটনা। সহসা একজন আগন্তুক এসে খলিফার দরবারে হাজির হলো। আগন্তুক খলিফাকে উদ্দেশ করে বলল, 'হে আমিরুল মু'মেনীন! আপনি এ মহান রাষ্ট্রের বিশাল কোষাগারের একচ্ছত্র মালিক। এ সরকারি কোষাগার তো আপনারই হাতে। অথচ আপনি অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করে থাকেন। তা ছাড়া আপনার পরনে প্রায়শই তালি দেয়া পোশাক দেখা যায়। বায়তুলমালে অত সম্পদ থাকতে আপনি কেন তালি দেয়া পোশাক পরিধান করেন? একটা ভালো পোশাক তৈরি করে নিলেই তো পারেন।'

লোকটির কথা হযরত আলী (রা)-এর পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, 'তুমি ভুল করছ আগন্তুক। বায়তুলমাল রাষ্ট্রের কোষাগার। বায়তুলমাল দেশের সাধারণ মানুষের সম্পদ। রাষ্ট্রের খলিফা হিসেবে আমি বায়তুলমালের পাহারাদার মাত্র। আমি ইচ্ছা করলেই বায়তুলমাল থেকে আমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারি না। তাই আমি যা পাই তা দিয়েই সংসার চালাই এবং প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করি। সাধারণ মানুষের অর্থ দিয়ে নিজের জন্য কিছু করা জায়েজ নয়।'

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত আলী (রা) কিভাবে জীবনযাপন করতেন?

২. পোশাক আশাকের ব্যাপারে আলী (রা) কী ভাবতেন?

৩. আলী (রা) কী ধরনের পোশাক পরিধান করতেন?

৪. পোশাকের ব্যাপারে আলী (রা) একদিন কী মন্তব্য করেছিলেন?

মহাবীর হযরত আলী (রা)

হযরত আলী (রা) একজন মহান খলিফা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না, তিনি বীর যোদ্ধা হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর বীরত্বের কথা সমগ্র আরব দুনিয়ার মানুষ অবগত ছিল। আলী (রা)-এর বীরত্বগাথা আরবজাহান ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।
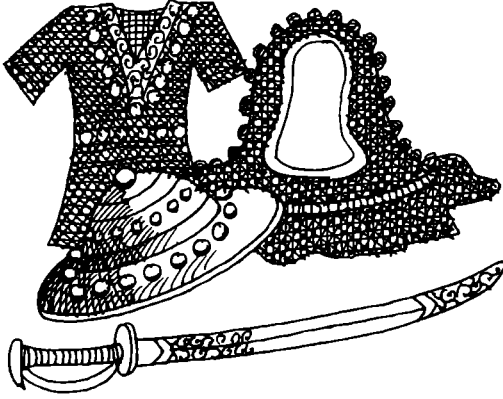
তাই ইসলামের শত্রুরা আলী (রা)-এর নাম শুনলেই আঁৎকে উঠত। আলী (রা)-এর মতো অসীম সাহসী বীর সে যুগে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। শত্রুর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর এ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের এক ঘটনা। ইসলামকে শেষ করার জন্য শত্রুরা বদর প্রান্তরে এসে জড়ো হয়েছে। আসল যুদ্ধ শুরু করার আগে শত্রুরা মুসলমানদের সাথে শক্তির পরীক্ষা করার প্রস্তাব দিলো। তবে এটা ছিল তাদের এক ধরনের চালাকি।

তারা ভাবছিল, যুদ্ধের আগেই যদি শক্তি পরীক্ষায় মুসলমানদের কাবু করা যায়, তা হলে তারা হতাশ হয়ে পড়বে, তাদের মনোবল ভেঙে যাবে। ফলে

মুসলমানরা আসল যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ভয় পাবে। আর এভাবে সহজেই মুসলমানদের পরাস্ত করা যাবে।

বদরে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। মুসলমানদের ৩১৩ জন সৈন্যের বিপরীতে শত্রুরা ১,০০০ সৈন্য এনে হাজির করল। তা ছাড়া তাদের কাছে অন্যান্য অঢেল সামরিক অস্ত্রও ছিল। তাই শক্তির লড়াই শুরু করার আগে শত্রুরা মুসলমানদের উপহাস করল।

কাফেরদের শক্তির এ আস্ফালন দেখে মহানবী (সা) বীর হামযা, উবাইদা এবং হযরত আলীকে শক্তির লড়াই করার জন্য পাঠালেন।

দেখতে দেখতে বীর হামযার তরবারির আঘাতে শত্রু উতবার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সে ছিল কাফেরদের মধ্যে অন্যতম বড় নেতা। ইসলামের পরম শত্রু ছিল এ উতবা। মুসলমানদের সে সীমাহীন যন্ত্রণা দিয়েছিল। তবে সে হযরত হামযার কাছে সহজেই কুপোকাত হলো। এদিকে হযরত উবাইদা (রা) লড়াই করলেন বীর শাইবার সাথে। কিন্তু লড়াই করতে গিয়ে উবাইদা (রা) বেশ ভালোভাবে আহত হলেন। উবাইদা (রা)-এর আহত হবার ঘটনায় শত্রুরা উৎফুল্ল হলো। এতে তারা বেশ উদ্দীপ্ত হলো। বিপরীত পক্ষে, এ ঘটনায় মুসলমানরা বিচলিত হলেন। তাদের উদ্বেগ বেড়ে গেল।

এ অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন হযরত আলী (রা)। তিনি শাইবার সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। তবে শাইবার জন্য ছিল চরম দুর্ভাগ্য। মহাবীর হযরত আলী (রা)-এর তরবারির আঘাতে শাইবার দেহ জর্জরিত হলো। নিমিষেই শাইবা নিহত হলো।

এভাবে একে একে উতবা ও শাইবার মতো দু'জন বীর নিহত হলে কাফেরদের মনোবল কাঁচের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। এতক্ষণ ধরে যে শক্তির দম্ভে তারা মেতেছিল তা সহসাই থেতলে গেল। প্রাথমিকভাবে কাফেরদের শক্তির অহঙ্কার বদরের প্রান্তরে লুটিয়ে পড়ল।

তারপরও শত্রুদের সাধ মিটল না। তারা কম সংখ্যক মুসলমানকে পরাস্ত করার সাহস নিয়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ঘোষণা দিলো। কিন্তু আল্লাহর কী শান! দু'পক্ষের লড়াইয়ে বদরের প্রান্তরে কাফেরদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল।

খয়বর যুদ্ধের আরেক ঘটনা। মদীনা থেকে ২০০ মাইল দূরে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত এ খয়বর। এখানে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের এক

ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হলো। এই লড়াই ছিল বেশ কঠিন। উনিশ দিন ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে চলল তীব্র লড়াই। কিন্তু শত্রুরা ছিল বেশ শক্তিশালী। তাই শত্রুদের সাথে মুসলমানরা পেরে উঠতে পারলেন না। শত্রুদের দূর্গ জয় করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হলো না। এতে মুসলিম সেনারা গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন।
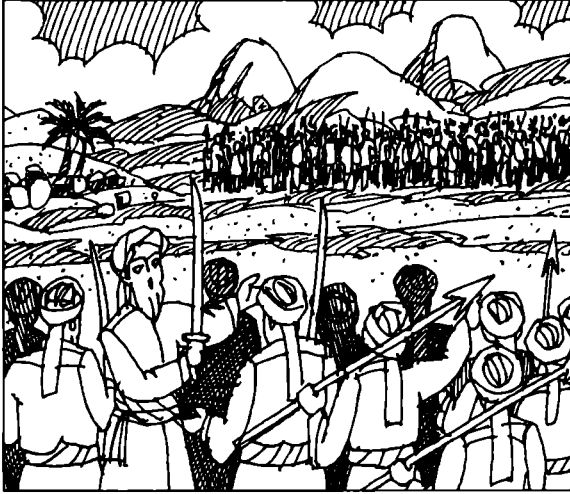
মহানবী (সা) নিজেও যুদ্ধের তীব্রতা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। যুদ্ধের কৌশল নিয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করা হলো। যুদ্ধে সাফল্য পাওয়ার বিকল্প পথও আলোচনায় স্থান পেল। অনেক ভাবনার পর অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, ইসলামের পতাকা এবার অন্য কারো হাতে তুলে দেয়া হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাই করা হলো। ইসলামের ঝাণ্ডা এবার তুলে দেয়া হলো হযরত আলী (রা)-এর হাতে। তার মানে সেনাপতির দায়িত্ব এবার আলী (রা)-এর ওপর বর্তাল। অথচ তিনি তখন চোখের তীব্র যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। যন্ত্রণায় তিনি রীতিমত ছটফট করছিলেন।

খোদার কী শান! এমন সময় ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) আলী (রা)-এর চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন। এতে আলী (রা)-এর চোখ নিমিষেই ভালো হয়ে গেল। বিস্ময়কভাবে তাঁর চোখের যন্ত্রণাও দূর হয়ে গেল। আলী (রা) পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এরপর তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। আলী (রা) পুরো উদ্যোমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি দুর্দান্ত সাহসিকতা ও যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করে ইহুদিদের সব বাধা তছনছ করে দিলেন। লড়াই হচ্ছিল কামুস দুর্গ নিয়ে। আলী (রা) এটি দখলের সকল বাধা সহজেই দূর করে ফেললেন। দুর্গের কপাট খুলতে গিয়ে ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। কামুস দুর্গের দরজা খুলতে যেখানে অন্তত ৭০ জন লোকের প্রয়োজন হতো, আলী (রা) আল্লাহর কৃপায় একাই তা উপড়ে ফেললেন। এর ফলে খয়বর যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বিদ্যুতের গতিতে বদলে গেল। ইহুদিরা আলী (রা)-এর সাহসিকতা এবং বীরত্ব দেখে ঘাবড়ে গেল। তাই তারা দলে দলে পালাতে শুরু করল। আল্লাহর রহমতে আলী (রা) খয়বর জয় করলেন।

এমনি করে প্রতিটি যুদ্ধেই আলী (রা) অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে হযরত আলী (রা)-এর নামডাক দ্রুত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি আরবজগতে একজন বিখ্যাত বীরের মর্যাদা লাভ করলেন। খয়বরে হযরত আলী (রা)-এর বীরত্বে মহানবী (সা) মুগ্ধ হলেন। তখন তিনি হযরত আলী (রা)-এর প্রতি খুশি হয়ে তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করলেন। 'আসাদুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর সিংহ।

কেউ কেউ হযরত আলী (রা)-কে 'শের-এ-খোদা' বলেও সম্বোধন করত। 'শেরে-এ-খোদা' মানে খোদার বাঘ। প্রচলিত আছে যে, মহাবীর হযরত আলী (রা)-এর নাম শুনলে অনেক সময় পরাক্রমশালী শত্রুরাও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেত।

অথচ আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত নিরহঙ্কারী মানুষ। তিনি তাঁর বীরত্ব নিয়ে মোটেও গর্ব করতেন না। তিনি মনে করতেন, তাঁর এ অসীম সাহস ও শক্তি মহান আল্লাহর অপার নিয়ামত মাত্র। তাই এটা নিয়ে বড়াই করার কোনো কারণ নেই। মহাবীর আলী (রা) তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতাকে শুধু ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি কখনও তাঁর সাহসিকতাকে অন্য কাজে ব্যয় করেননি। হাতের মুঠোয় যখন শত্রুকে পেয়েছেন, তখন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ ছাড়া আলী (রা) কোনো শত্রুকে খতম করেননি।

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য আলী (রা) কখনও কারো সাথে আপস করেননি। তিনি সবসময় সাহসের সাথে বীরের বেশে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। ফলে সাফল্য তাঁর হাতে এসে ধরা দিয়েছে। তিনি আল্লাহতাআলার রহমত ও বরকত পেয়ে সফলকাম হয়েছেন।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত আলী (রা) কী হিসেবে পরিচিত ও বিখ্যাত ছিলেন?

২. তিনি কাকে তরবারির আঘাতে নিহত করলেন?

৩. খয়বর কোথায় অবস্থিত?

৪. খয়বরে কাদের সাথে মুসলমানদের লড়াই হলো?

৫. খয়বরে কতদিন ধরে লড়াই হয়েছিল?

৬. কামুস দুর্গের কপাট কে খুলে ফেললেন?

৭. কামুস দুর্গ খুলতে কত জন লোকের প্রয়োজন হতো?

৮. খয়বরে সাহস প্রদর্শনের জন্য আলী (রা) কী খেতাব লাভ করেন?

৯. কে এ খেতাব দিয়েছিলেন? খেতাবটির অর্থ কী?

১০. কেউ কেউ আলী (রা)-কে কি বলে ডাকতেন? তার অর্থ কী?

মহান আল্লাহর জন্য

হযরত আলী (রা)-কে চিনত না এমন কোনো সাহসী বীর তখনকার দুনিয়ায় আর কেউ ছিল না। শত্রুরা তো তাঁর নাম শুনে প্রচণ্ড ভীতির মধ্যে থাকত। তারপরও অনেকে তার বীরত্ব জাহির করতে গিয়ে হযরত আলী (রা)-এর সাথে লড়াই করতে দুঃসাহস দেখাত। একবার এক শত্রু আলী (রা)-এর সাথে মল্লযুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিলো। অবশেষে হযরত আলী (রা)-এর সাথে কাঙ্খিত মল্লযুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে আলী (রা) শত্রুকে অতি সহজেই কাবু করে ফেললেন।

তবে শত্রুটি ছিল বেশ বজ্জাত। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আলী (রা) শত্রুর বুকের ওপর চেপে বসলেন। শত্রুটি এতে নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। আলী (রা) খাপ থেকে তরবারি খুলে শত্রুকে খতম করার জন্য উদ্যত হলেন। আর এমন সময়ই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। শত্রুটি বাঁচার জন্য এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করল। সহসা সে হযরত আলী (রা)-এর মুখে থুথু ছুঁড়ে মারল। এতে আলী (রা) ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর মাথায় প্রচণ্ড ক্রোধ চেপে বসল। উপস্থিত লোকেরা সবাই ভাবল এবার তো শত্রুর আর রক্ষা নেই।

আলী (রা)-এর হাত থেকে লোকটির বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। নিশ্চয়ই আলী (রা) তরবারির আঘাতে শত্রুকে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। কিন্তু না। ঘটনা ঘটল উলটো। আলী (রা) তাঁর জেদকে সংযত করে ফেললেন। আর অমনি তিনি শত্রুর বুক থেকে দ্রুত নিচে নেমে পড়লেন। আলী (রা) তাঁর উন্নত তরবারি নামিয়ে ফেললেন এবং শত্রুকে ছেড়ে দিলেন।

আলী (রা)-এর কাণ্ড দেখে লোকেরা হতবাক হলো। শত্রুটিও অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। একি করলেন আলী (রা)! বাগে পেয়েও শত্রুকে ছেড়ে দিলেন? আলী (রা)-এর এ বিস্ময়কর আচরণ তাঁর শত্রুটি কল্পনাও করতে পারেনি। আলী (রা)-এর ব্যবহার দেখে শত্রুর ঘোর যেন কাটে না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে শত্রুটি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে মহান বীর! আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। আমাকে আপনি জানে মারতে চেয়েছিলেন। আপনার মুখে থুথু মারায় আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। এর হেতু জানতে পারি কি?'

আলী (রা) বললেন, 'দেখ, তোমার সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই। যদিও আজ তুমি আমার শত্রু বটে। আমি তোমার সাথে লড়াই করছিলাম ইসলামের জন্য। তোমাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলাম শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু যেই মাত্র তুমি আমার মুখে থুথু ছুঁড়ে মারলে, তখন আমি চরম উত্তেজনা ও রাগ অনুভব করছিলাম। এই রাগের সময় যদি আমি তোমাকে হত্যা করতাম, তা হলে এটা হতো নির্ঘাত হত্যাকাণ্ড। হত্যা করা আমার জন্য মহাপাপের কাজ হতো। আর এ হত্যাকাণ্ডের জন্য আমি আল্লাহর নিকট দায়ী হয়ে যেতাম।'

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আলী (রা)-এর মধ্যে এমন সুন্দর চিন্তা কতই না অপূর্ব! প্রকৃতপক্ষে, এটাই একজন সাচ্চা মুমিনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

ব ল তে পা রো ?

১. আলী (রা)-এর নাম শুনলে শত্রুরা কী অনুভব করত?

২. একবার মল্লযুদ্ধে আলী (রা)-এর শত্রুটি কী করল?

৩. আলী (রা) বাগে পেয়েও শত্রুকে আঘাত করলেন না কেন?

৪. এ ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

বায়তুলমালের রক্ষক

খোলাফায়ে রাশেদার আমলের কথা। তখন ছিল ঝলমলে এক সোনালি যুগ। ইসলামী আদর্শ গর্বে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্র তার অভাবনীয় সাফল্যে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তখন ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফারা ছিলেন খুবই দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। ন্যায়নীতি ও আমানতদারির মাপকাঠিতে তাঁরা ছিলেন সেরা মানুষ। রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষায় খলিফারা কী যে যত্নবান ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।
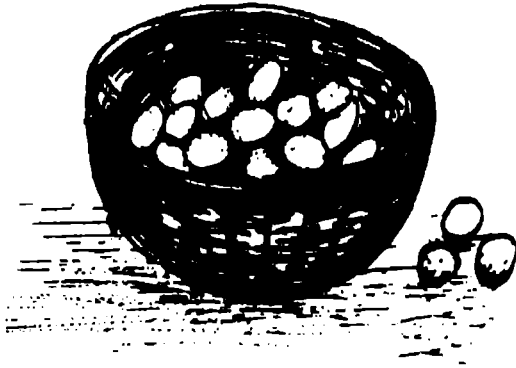
খেলাফতের কোষাগারকে সে যুগে 'বায়তুলমাল' বলে অভিহিত করা হতো। বায়তুলমাল সবার কাছে ছিল পবিত্র আমানত। তাই বায়তুলমালকে তাঁরা সর্বদা প্রকৃষ্ট আমানতদারির সাথে ব্যবহার করতেন। বায়তুলমাল থেকে যে কোনো খরচের ব্যাপারে খলিফারা সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতেন। লক্ষ্য করা গেছে, বায়তুলমাল থেকে একটি পয়সাও এদিক সেদিক হলে তারা অত্যন্ত কঠোর হয়ে যেতেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি বায়তুলমালের ব্যবহার সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন।

বায়তুলমালে প্রায়ই বিভিন্ন জিনিসপত্র এসে জমা হতো। দেশের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সওয়াবের নিয়তে মুসলমানরা বায়তুলমালে অকাতরে দান করতেন। মানুষের দান এবং সাহায্যে সমৃদ্ধ হতো বায়তুলমালের আকার।

হযরত আলী (রা)-এর খেলাফত আমলের এক ঘটনা। একদা বায়তুলমালে প্রচুর লেবু এসে জমা হলো। লেবুগুলো বেশ সুন্দর ও তরতাজা ছিল। হযরত আলী (রা) সেদিন বায়তুলমাল পরিদর্শন করছিলেন। বলা বাহুল্য যে, খলিফারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে মাঝেমধ্যে বায়তুলমালের খোঁজখবর নিতে এভাবে পরিদর্শনে যেতেন। অনেক সময় আলী (রা)-এর সাথে পুত্র হাসান ও হোসেনও অংশ নিতেন। এতে তারা বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন। একদিন তারা বাবার সাথে ঘুরে ঘুরে বায়তুল দেখছিলেন। তরতাজা লেবু ও তার খুশবু তাদের আকৃষ্ট করল। তাই তারা একটি করে লেবু হাতে তুলে নিলেন। বিষয়টি খলিফা হযরত আলী (রা)-এর নজর এড়াল না। ছেলেদের এ কাজ তাঁর কাছে মোটেও পছন্দ হলো না। তিনি পুত্রদের হাত থেকে লেবু দু'টি কেড়ে নিলেন। অতঃপর লেবুগুলো তিনি বায়তুলমালে জমা দিয়ে দিলেন।

সামান্য দু'টি লেবু মাত্র। দাম আর কী হবে? তেমন কি বড় কিছু? তা ছাড়া হাসান ও হোসেন বাচ্চা ছেলে, অবুঝ ও নির্দোষ। তরতাজা ও সবুজ লেবু দেখতে ওদের ভালো লেগেছে, তাই দু'টো মাত্র লেবু শখ করে হাতে নিয়েছে। এ নগণ্য কাজটিও মানতে চাইলেন না হযরত আলী (রা)। কারণ একটাই। এগুলো যে বায়তুলমালের সম্পদ। আর বায়তুলমাল দেশের আপামর মানুষের সম্পদ। খোলাফায়ে রাশেদার যুগে খলিফাদের চরিত্র এমনই পুত-পবিত্র ছিল। দেশ ও দশের স্বার্থের ব্যাপারে তারা বিস্ময়করভাবে সচেতন ছিলেন। অন্যায় যত ছোটই হোক না কেন, খলিফারা তা মেনে নিতেন না, সহ্য করতেন না।

ব ল তে পা রো ?

১. রাষ্ট্রীয় কোষাগার খেলাফত যুগে কী নামে পরিচিত ছিল?

২. বায়তুলমালে একবার কী ফল এসে জমা হলো?

৩. হাসান ও হোসেন কী করলেন?

৪. আলী (রা) লেবু নিয়ে তাঁর ছেলেদের সাথে কী ব্যবহার করলেন?

৫. এ কাহিনী থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

দুঃখি মানুষের সেবায়

হযরত আলী (রা) বড় লোক ছিলেন না। তাঁর পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। তীব্র অভাব-অনটনের মধ্যেই তিনি বড় হয়েছেন। সচ্ছলতার মুখ আলী (রা) খুব কমই দেখেছেন। পিতা আবু তালিব কোনো রকমে কামাই রোজগার করে সংসার চালাতেন। তাই ছোটবেলা থেকেই হযরত আলী (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ঘরে লালিত-পালিত হন।

দরিদ্র হলে কী হবে? হযরত আলী (রা)-এর মন ছিল অনেক বড়। সে যুগে তাঁর মতো বড় হৃদয়ের মানুষ খুবই কম ছিল। মানুষের উপকারের জন্য তাঁর হৃদয় ছিল অবারিত। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখলে তিনি মর্মপীড়ায় ভেঙে পড়তেন। যতক্ষণ না দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের উপকার করতে পারতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মন শান্ত হতো না। কেউ এসে কিছু চাইলেই হলো। হযরত আলী (রা) তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না।
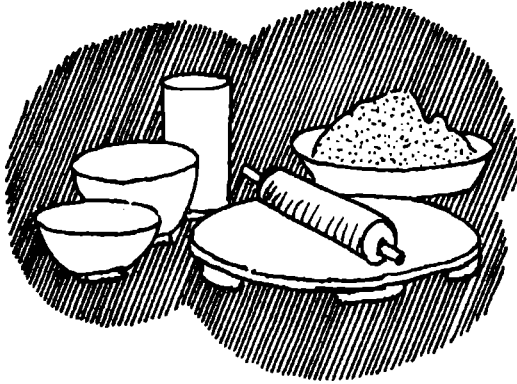
হযরত আলী (রা) এক সময় মদীনা রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচিত হলেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হলেন তিনি। খলিফা হলে কী হবে? খলিফা হওয়ার পর হযরত আলী (রা)-এর জীবনে কোনো পরিবর্তন এলো না। তাঁর অভাব-অনটন যেমনটি ছিল, তাই রয়ে গেল।

একদিন হযরত আলী (রা) তাঁর অফিসে রাষ্ট্রের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। অফিসে তাঁর অনেক কাজ। খলিফা বলে কথা। কাজকর্ম তো থাকবেই। কাজের মাঝে এতটুকু ফুসরৎ পেলেন না। কাজ করতে করতে এক সময় তাঁর বেশ ক্ষুধা পেয়ে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় তিনি একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু টেবিলের কাজ শেষ হলো না। অনেক কাজ। অথচ অনেক চেষ্টা করেও তিনি কাজে মন বসাতে পারছিলেন না।

পরিশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর নিয়ে তিনি বাড়ি চলে এলেন। মনে মনে ভাবলেন খেয়ে একটু বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু বাড়িতে গিয়েও তিনি হতাশ হলেন। কারণ, ঘরে খাবারের মতো কিছুই ছিল না। হযরত আলী (রা) ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন সংসারের লোকজনও সবাই উপোস। না খেয়ে আছেন। এ অবস্থায় আলী (রা) আর কী করবেন? সবার কষ্ট দেখে নিজের ক্ষুধার কথা তিনি ভুলে গেলেন। এখন যে খাবার জোগাড় করা দরকার। তাই তিনি কাজের খোঁজে বের হয়ে গেলেন। তবে অনেকক্ষণ ঘুরেফিরে কোথাও কাজের সন্ধান পেলেন না। অবশেষে কাজ খুঁজতে খুঁজতে একসময় এক জায়গায় এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একজন লোক কাজের জন্য লোক খুঁজছিল। সে আলী (রা)-কে তার বাগানে পানি তোলার কাজ দিলো। সারারাত ধরে হযরত আলী (রা) লোকটির বাগানে পানি দিলেন। কাজ করতে করতে একসময় ভোর হয়ে গেল।

হযরত আলী (রা) সারারাত ধরে বাগানে পানি তোলার কাজ করেছেন। কাজের শেষে মজুরির যে সামান্য অর্থ পেলেন তা দিয়ে দোকান থেকে সামান্য কিছুটা আটা কিনে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। তা দিয়ে খাবার তৈরি করা হলো। পরিবারের সবাইকে নিয়ে আলী (রা) খেতে বসেছেন মাত্র। এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়াল এক ভিখারী। সে জানাল সে পেটের ক্ষিধেয় অস্থির। এতে হযরত আলী (রা)-এর মন লোকটির কষ্টের কারণে কেঁদে উঠল। তাই খাবারের পুরোটাই তিনি ভিখারীকে দিয়ে দিলেন।

আটার কিছুটা অংশ তখনও ঘরে ছিল। এ অংশটুকুর অর্ধেক দিয়ে স্ত্রী ফাতিমা (রা) পুনরায় খাবার তৈরি করলেন। কি অবাক কান্ড! খেতে বসার আগেই হযরত আলী (রা)-এর দরজায় এসে দাঁড়াল এক ইয়াতিম। সেও জানাল, সে বেশ ক্ষুধার্ত, খাবার দরকার। আলী (রা) আর কিছুই ভাবলেন না, বরং খাবারের পুরোটা তিনি ইয়াতিম বালককে দিয়ে দিলেন। খাবার

বিলিয়ে দিয়ে পরিবারের লোকেরা পেটের ক্ষিধেয় অনেকক্ষণ ছটফট করলেন। আটার যে অর্ধেক বাকি ছিল, তা দিয়ে আবারো খাবার তৈরি করা হলো। তীব্র ক্ষুধায় আলী (রা)-এর পেটের অবস্থা খুবই নাজুক। আর যে সহ্য করা যাচ্ছে না। তাঁর পরিবারের অন্যদের অবস্থাও একই রকম। তাই শেষবারের মতো পেটে কিছু দানা পানি দেয়ার চেষ্টা করলেন আলী (রা)।

এবারও খেতে যাবেন। এমন সময় সেখানে ঘরের দরজায় এসে হাজির হলো এক ইহুদি কয়েদী। সেও জানাল, সে খুব ক্ষুধার্ত। ইহুদি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হযরত আলী (রা)-এর নিকট কিছু খাবার চাইল। আলী (রা) এবারও নিজের শেষ খাবারটুকু ইহুদির হাতে তুলে দিলেন। ঘরে আর কিছুই রইল না। শেষমেশ আলী (রা) নিজেই উপবাস রইলেন।

অবশেষে আলী (রা) মাত্র এক গ্লাস পানি পান করে ক্ষুধা নিবারণ করার চেষ্টা করলেন। আর তাতেই পরম করুণাময় আল্লাহতাআলার শোকরিয়া আদায় করলেন। অতিথি সেবা করে তিনি এখন মহাখুশি। মানুষের সেবা করতে পেরে আলী (রা) তাঁর পেটের তীব্র ক্ষুধার কথাও ভুলে গেলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. একবার কাজ করতে করতে খলিফা আলী (রা)-এর কী হলো?

২. তিনি কী কাজ খুঁজে পেলেন?

৩. পারিশ্রমিক হিসেবে আলী (রা) কী পেলেন?

৪. রাতে খেতে বসলে কী ঘটল?

৫. অবশেষে আলী (রা) কী করলেন?

মহান খলিফার সাদাসিধে জীবন

আমাদের প্রিয় খলিফারা ছিলেন অবিশ্বাস্য রকমের আদর্শবান মানুষ। তাঁরা ছিলেন মহৎ জীবনের অধিকারী ও ন্যায়পরায়ণ মহামানব। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ থেকে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের সবাই প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সব সুন্নাত যথাযথভাবে পালনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। এসব মহান মানুষেরা কোনো কাজই নবী (সা)-এর মতের বাইরে করতেন না। কথাবার্তা, আমল-ইবাদাত, খাওয়া-পরা-এসব যাবতীয় কাজ তাঁরা মহানবী (সা)-এর মতো করে সম্পাদন করতেন।
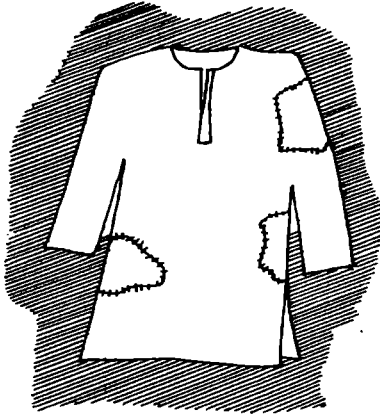
আমাদের মহান খলিফাদের জীবন-যাপন প্রণালী তাই ছিল খুব সাদাসিধে। তার মধ্যে হযরত আলী (রা) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন নবী জীবনের অনন্য আদর্শ। তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতি ছিল অতি সহজ সরল ও সাদাসিধে। তিনি একসময় খেলাফতের দায়িত্ব পেলেন এবং তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি যে হত-দরিদ্র ছিলেন খলিফা হওয়ার পর তাই রয়ে গেলেন।

খলিফা হবার পরও তাঁর জীবনে কোনো পরিবর্তন এলো না। না পোশাক-আশাকে, না খাওয়া-দাওয়ায়, না চলাফেরায়। তাঁর পোশাক-আশাক ছিল জীর্ণশীর্ণ। তিনি প্রায়ই তালি দেয়া পোশাক পরিধান করতেন।

হযরত আলী (রা) খলিফা হবার পর অনেকে তাঁকে আগের পোশাক পরিবর্তনের কথা বলতেন। কিন্তু আলী (রা) এ ব্যাপারে কারো পরামর্শ কানে তুলেননি। পোশাকের ব্যাপারে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, 'দেশের বেশির ভাগ সাধারণ মানুষজন তো এ জীর্ণ পোশাকই ব্যবহার করছে। তাই আমার এ পোশাক ব্যবহারে দোষ কিসের?'

তিনি অনেক সময় অনেকের কথার চাপে পড়লে বলতেন, 'আগে দেশের মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটুক। তাদের জীবন মানের পরিবর্তন হউক। জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারলে আমিও আমার পোশাকের পরিবর্তন করার চেষ্টা করব।' পোশাকের ব্যাপারে একদা এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে হযরত আলী (রা) এক সুন্দর কথা বললেন। তিনি বললেন, 'সাধারণ পোশাক পড়লে অতি সহজে নম্র ও বিনয়ী হওয়া যায়। আর এ পোশাক গায়ে থাকলে গর্ব ও অহঙ্কার দূর হয়ে যায়।'

কত বিনয়ী, সহজ-সরল ও সাদাসিধে ছিল হযরত আলী (রা)-এর জীবন। আমরা যদি এমন সাদাসিধে জীবনযাপন করতে পারি তা হলে অবশ্যই আমাদের মন থেকে সব অহঙ্কার ও গর্ব মুছে যাবে। আমরা অনায়াসে পবিত্র জীবনের অধিকারী হতে পারব।

ব ল তে পা রো ?

১. আলী (রা) কেমন পোশাক পরিধান করতেন?

২. পোশাকের ব্যাপারে আলী (রা) কী বলতেন?

৩. আলী (রা)-এর মতে সাধারণ পোশাক পড়লে কী হওয়া যায়?

বিনয়ী মানুষ আলী (রা)

মহামতি খলিফা হযরত আলী (রা) কেবল পোশাক-আশাকেই সহজ-সরল ছিলেন না। তাঁর গোটা জীবনই ছিল নম্রতা ও ভদ্রতায় পরিপূর্ণ। তাঁর কথাবার্তা ছিল বিনয়ের অলঙ্কারে ভরপুর। তিনি একজন সত্যিকারের বিনয়ী মানুষ হিসেবে সবার কাছে সুপরিচিত ছিলেন।

একবার এক লোক এসে হযরত আলী (রা)-এর কাছে হাজির হলো। সে হযরত আলী (রা)-কে প্রশ্ন করতে চাইল। আলী (রা) তার কথায় সায় দিলেন। লোকটির প্রশ্ন ছিল এ রকম, 'নবী করীম (সা)-এর পরে কোন ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিতে উত্তম?'
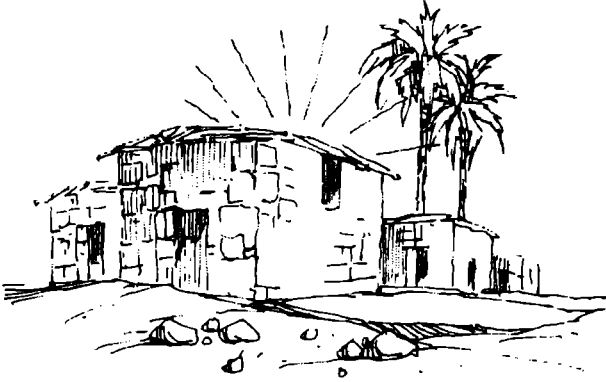
আলী (রা) তাৎক্ষণিকভাবে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জবাব দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই তিনি হবেন আল্লাহতাআলার নবী (সা)-এর একান্ত সহচর ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু বকর (রা)।'

তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আচ্ছা বলুন, এর পর কে উত্তম?'

আলী (রা) জবাব দিলেন, 'তিনি আর কেউ নন। নিঃসন্দেহে তিনি হযরত হযরত উমর (রা)।'

এবার প্রশ্নকারী ভাবলেন, এবার হযরত আলী (রা)-কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি হয়তো বলবেন, এরপর উত্তম ব্যক্তি হলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসমান (রা)।

তাই প্রশ্নকারী একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি এবার প্রশ্ন এড়িয়ে সরাসরি বললেন, 'তারপর নিশ্চয়ই আপনি উত্তম।'

প্রশ্নকর্তার মুখে এ কথা শুনে হযরত আলী (রা) বিব্রতবোধ করলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, 'না, ভাই। আপনার ধারণা সঠিক নয়। আমি অন্যান্য মুসলমানের মতোই একজন সাধারণ মুসলমান মাত্র। আমি উত্তম হতে যাব কেন?'

কি সুন্দর জবাব দিলেন হযরত আলী (রা)। নিজের বড়ত্ব ও উত্তম হওয়ার বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেলেন, বরং নিজেকে ছাড়া অন্যদের তিনি বড় বলে ভাবতেন। কতই না বিনয়ী ছিলেন হযরত আলী (রা)।

হযরত আলী (রা) নিজেকে কখনও উত্তম বলে ভাবতে পারেননি। তিনি জানতেন সত্যিকার অর্থে নিজেকে নিজে বড় বা উত্তম মনে করা হচ্ছে অহঙ্কার। আর অহঙ্কার পতনের কারণ। তাই অহঙ্কার প্রকাশ থেকে মহাবীর হযরত আলী (রা) বেঁচেছিলেন।

আমরাও হযরত আলী (রা)-এর এই মহৎ গুণকে ধারণ করব। আমরা অহঙ্কার প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকব। আর তা হলেই প্রকৃত বিনয়ের প্রকাশ পাবে।

ব ল তে পা রো ?

১. আলী (রা) কেমন মানুষ ছিলেন?

২. হযরত আলী (রা)-এর মতে উত্তম লোক কারা ছিলেন?

৩. নিজেকে উত্তম মনে করার ক্ষেত্রে আলী (রা)-এর মন্তব্য কী ছিল?

৪. আমরা এ কাহিনী থেকে কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

ক্রীতদাসের সাহায্যের জন্য

গ্রীষ্মকালের এক ভর দুপুর বেলা। প্রচণ্ড রোদ নেমেছে আরবে। মরুময় আরবে চলছে পুরোদস্তর গ্রীষ্মকাল। প্রখর রৌদে গায়ের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। রাশি রাশি বালুর ওপর রোদ পড়ে তা থেকে যেন আগুনের লেলিহান বেরিয়ে আসছে। গ্রীস্মকালে আরবের এটাই বাস্তব অবস্থা। এমন সময় লোকজন ঘরের বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছিল। তাই রাস্তা-ঘাটে তেমন কোনো লোকজন চোখে পড়ছে না। প্রখর রোদের থাবা থেকে বাঁচার জন্য লোকেরা যার যার ঘরে অবস্থান নিয়েছে।

হযরত আলী (রা) জোহরের নামায শেষ করে সবেমাত্র মসজিদ থেকে বেরিয়েছেন। আগুন ছড়ানো রাস্তায় পা ফেলেছেন তিনি। প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে তিনি হাঁটছেন। ধীরে ধীরে তিনি চলছেন বাড়ির দিকে। চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে আলী (রা) থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে রাস্তার পাশে বসে কাঁদছে এক ক্রীতদাসী। তার কান্না দেখে আলী (রা)-এর মন ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল। তাই তিনি এগিয়ে গেলেন ক্রীতদাসীর কাছে। মেয়েটি তখন ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছিল।

আলী (রা) মেয়েটিকে নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা! কি হয়েছে তোমার? তুমি কাঁদছ কেন? আমাকে বলো, দেখি আমি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা।'

কোনো কথাই বলছে না মেয়েটি। সে শুধু কেঁদেই চলছে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে সে। খলিফা বারবার তার কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর একসময় মেয়েটি কথা না বলে পারল না। সে অবশেষে মুখ খুলল। মেয়েটি কাতর স্বরে বলল–'আমার মনিব আমাকে বাজার থেকে খেজুর আনতে বলেছিল। আমি তার আদেশ মতো খেজুর কিনে আনলাম। কিন্তু সে খেজুর মনিবের পছন্দ হয়নি। তাই মনিব খেজুরগুলো ফেরত দিয়ে দাম ফেরত আনতে বলেছেন। আমি ফের বাজারে গেলাম। খেজুরঅলার কাছে সব ঘটনা জানিয়ে খেজুরের দাম ফেরত চাইলাম। কিন্তু দোকানদার খেজুর ফেরত না দিয়ে বরং আমাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ব্যর্থ মনোরথে মনিবের কাছে ফিরে গেলাম। মনিব আমার কথা না শুনে আমাকে ভীষণ মারধর করেছে।'

মেয়েটি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কথাগুলো বলছিল আর কাঁদছিল। সে আরো জানাল, 'শুনুন জনাব, আমি মার খেয়ে আবার খেজুরঅলার কাছে গেলাম। তাকে আমার কষ্টের কথা জানালাম। মনিবের আচরণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। আমি হাতজোর করে দোকানদারকে খেজুরগুলো ফেরত নিতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু সে কিছুতেই খেজুর ফেরত নিলো না এবং দামও ফেরত দিলো না। বরং সেও আমাকে ভীষণভাবে মেরেছে হুজুর।' কথাগুলো শেষ হতে না হতেই আবার ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটি। সে জানাল, 'আপনিই বলুন, এখন আমি কী করব? কোথায় যাবো? আমার এখন কী হবে? আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচান, হুজুর।'

এ কথা বলেই মেয়েটি এবার হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিলো। এভাবে মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে খলিফার মন ভারী হয়ে উঠল। তিনি মেয়েটির করুণ কান্না আর সইতে পারলেন না। তিনি মেয়েটিকে সান্তনা দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা তুমি থাম। আর কেঁদো না। দেখি, তোমার কী সাহায্য করা যায়? তোমার ব্যাপারটা আমি দেখছি।'

এ কথা বলেই খলিফা মেয়েটিকে নিয়ে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলেন। খেজুরঅলা তখন তার দোকানে শুয়ে আরাম করছিল। দোকানদার খলিফা হযরত আলী (রা)-কে চিনত না। তাই সে আলী (রা)-এর কথায়

কান দিলো না। হযরত আলী (রা) দোকানদারকে মেয়েটির সমস্যার কথা বারবার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন। খেজুরের দাম ফেরত দিতে তিনি খেজুরঅলাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, 'দেখ, তোমার জন্য মেয়েটি বেশ কষ্টে আছে। সে মনিবের প্রচণ্ড রোষের শিকার। তুমি এটা বুঝার চেষ্টা করো। তা হলে মেয়েটি তার সমস্যা থেকে বাঁচতে পারবে।'

কিন্তু দোকানি ছিল বেশ কঠোর ও নিষ্ঠুর। সে আলী (রা)-এর কোনো কথাই শুনল না। খলিফা আলী (রা) দোকানির এরূপ ব্যবহারে বেশ কষ্ট পেলেন। কি আর করবেন তিনি! উপায়ান্তর না পেয়ে আবারও দোকানিকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলেন। এবারও খলিফার আবেদন নিস্ফল হলো।

দেখতে দেখতে দোকানের সামনে এসে জড়ো হলো অনেকেই। এ দৃশ্য বাজারের অন্যান্য দোকানিরও চোখে পড়ল। তাই অনেকে এগিয়ে এলো। তাদেরই কেউ কেউ খলিফাকে দেখে চিনে ফেলল।

অন্যান্য দোকানিরা খলিফাকে সালাম দিয়ে সম্মান জানাল। খলিফার সাথে দোকানদারের এমন খারাপ ব্যবহারে তারা অবাক হলো। তাই তারা দোকানিকে উদ্দেশ করে বলল,' হায় হায়! একি করেছ তুমি? তুমি খলিফাকে চিনতে পারোনি? তিনি যে আমাদের মহান খলিফা। কী সর্বনাশের কথা। তুমি খলিফার সাথে এমন খারাপ আচরণ করলে?'

তারা খলিফাকে উদ্দেশ করে বলল, 'হে মহান খলিফা, আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা দেখছি ব্যাপারটা।' খলিফা আলী (রা)-এর পরিচয় জানতে পেরে লজ্জা ও ভয়ে দোকানির মুখ লাল হয়ে গেল। সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। এবার সে দোকান থেকে দ্রুত নিচে নেমে এলো। আর দোকানি তৎক্ষণাৎ খলিফার পা জড়িয়ে ধরল এবং তাঁর কাছে হাতজোড় করে মাফ চাইল।

দোকানির এ আচরণ খলিফার পছন্দ হলো না। তিনি দোকানির ব্যবহারে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে দোকানিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি এতক্ষণ বার বার কত অনুরোধ করলাম। তুমি আমার কোনো কথাই শুনলে না। তুমি আমাকে দুর্বল ভেবেছ। তাই আমার আবদারকে তুমি পাত্তাই দাওনি। অথচ আমার পরিচয় পেয়ে এখন ভয় পেয়েছ। আমার কাছে হাতজোর করে ক্ষমা চাচ্ছ। দেখতে দেখতে বাজারের অন্য সব দোকানিরা এসে ভিড় জমাল। ওদিকে ঘটনার খবর ক্রীতদাসীর মনিবের কাছেও পৌছে গেল। তাই সেও অত্যন্ত ভয় পেল।

মনিব ভাবছিল, আজ আর রক্ষা নেই। মেয়েটির প্রতি সে যে আচরণ করেছে তার শাস্তির ভয় তাকে অস্থির করে তুলল। খলিফা এখন তাকে কী কঠিন শাস্তি দেবেন এটাই মনিবের একমাত্র ভাবনা। সে ভয়ে ভয়ে আগুনঝরা রোদ ঠেলে ছুটল বাজারের দিকে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে দোকানের সামনে হাজির হলো ও খলিফার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

মনিব খলিফার কাছে বিনীতভাবে আরজ করে বলল–'হে মহান খলিফা, ক্রীতদাসীর সাথে দুর্ব্যবহার করে আমি অনেক বড় অপরাধ করেছি। আমাকে এবারের মতো মাফ করে দিন। আমি আর কোনোদিন ক্রীতদাসীর সাথে দুর্ব্যবহার করব না। নিজেকে অবশ্যই সংশোধন করে নেবো।'

মনিবের এ আচরণ দেখে খলিফা আরেকবার উত্তেজিত হলেন। তবে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। এরপর তিনি মনিবকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখ! মেয়েটি তোমার অধীনে আছে। সে নেহায়েত গরিব। তুমি একজন ক্রীতদাসীর সামান্য অপরাধ মাপ করতে পারলে না। তাকে প্রচণ্ড মারধোর করেছ। একজন দাসীর সামান্য অপরাধ যদি ক্ষমা করতে না পার, তা হলে তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাবে কিভাবে?'

খলিফার কথায় মনিব খুব লজ্জিত হলো। দোকানির মুখও লজ্জায় লাল হয়ে গেল। খলিফা আর কী করবেন। তিনি সবাইকে মাফ করে দিলেন। তারপর মহামতি খলিফা মেয়েটিকে মনিবের হাতে তুলে দিলেন। ক্রীতদাসীর অধিকার ফিরিয়ে দিতে পেরে খলিফার মন তৃপ্তিতে ভরে গেল।

কী মহৎ আমাদের প্রাণপ্রিয় খলিফা আলী (রা)! তাঁর মতো এমন বাদশাহ আজকাল দুনিয়ায় কী একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে?

ইসলামের সৌন্দর্য বুকে ধারণ করেই খলিফারা এমন মহান হতে পেরেছিলেন। আমরা তাদের এ মহান শিক্ষা মনে রাখব। তা হলেই আমরা মহীয়ান হতে পারব।

ব ল তে পা রো ?

১. রাস্তার পাশে আলী (রা) কাকে দেখলেন? সে কী করছিল?

২. ক্রীতদাসী মেয়েটির কী অপরাধ ছিল?

৩. খেজুরঅলা কেমন লোক ছিল?

দীনমজুর বেশে খলিফা

হযরত আলী (রা) একদিন অফিসে সরকারি কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করেছেন তিনি। অফিসের কাজ করতে করতে একসময় তাঁর খুব ক্ষিধে পেল। অথচ হাতের কাজও শেষ হলো না। ক্ষিধের জ্বালায় তিনি আর কাজ করতে পারছিলেন না। খলিফা কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না। পেটে যে কিছু দানাপানি না দিলেই নয়।

তাই আলী (রা) তড়িঘড়ি করে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে এসেই স্ত্রীকে খাবার দিতে বললেন। খলিফার কথা শুনে ফাতিমার বুক কেঁপে উঠল। কি খেতে দেবেন ক্ষুধার্ত স্বামীকে? ঘরে যে খাবার নেই। হাঁড়ি-পাতিল সবই শূন্য। বাড়িতে যে সবাই না খেয়ে আছে ,তা তিনি কিভাবে বলবেন খলিফাকে?
স্ত্রী ফাতিমার ইতস্তত ভাব দেখে ঘরের অবস্থা বুঝতে খলিফার আর বাকি রইল না। তিনি সবই আঁচ করতে পারলেন। কী আর করবেন খলিফা! অগত্যা আলী (রা) খাবার জোগাড় করতে কাজের খুঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি হাঁটছেন আর কাজের সন্ধান করছেন।

অনেক খোঁজাখুজির পরও কোনো কাজ পাওয়া গেল না। দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে বিকেলও পার হয়ে গেল। অথচ কাজের সন্ধান পাওয়া গেল না। হযরত আলী (রা) প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়লেন। অগত্যা তিনি বাড়িতে ফিরে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। যেই ভাবা সেই কাজ। এক বুক হতাশা নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন খলিফা।

এমন সময় ঘটল এক অবাক ঘটনা। এক সওদাগরের কাফেলা মালপত্র নিয়ে এখানটায় এসে হাজির হলো। খলিফার নজর পড়ল কাফেলার প্রতি। কাফেলায় ছিল পণ্য বোঝাই অনেক উট। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এবার হয়তো একটা কাজ পাওয়া যেতে পারে। তাই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অদূরেই কাফেলাটি এসে থামল। আলী (রা) দ্রুত কাফেলার কাছে এগিয়ে গেলেন। লোকদের কাছে কাজ চাইলেন। লোকেরা হযরত আলী (রা)-কে খলিফা বলে চিনত না। এদিকে মালামাল নামাতে কাজের লোকও দরকার পড়ল। তারা দিনমজুর ভেবে লোকটাকে একটা কাজ দিলো। সওদাগরের পণ্য ছিল অনেক। সেগুলো নামাতে নামাতে বেশ রাত হয়ে গেল। গভীর রাতে কাজ শেষ হলে লোকেরা খলিফাকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় করল।

হযরত আলী (রা) পারিশ্রমিক তো হাতে পেলেন। এতে মনে জোর এলো। কিন্তু তাতে কী? রাত গভীর, তাই এখন যে খাবারের ব্যবস্থা করা কঠিন। তাই আলী (রা) গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। খাবার যোগাড় করতে পারবেন তো?- এটাই এখন চিন্তা।

ভাবতে ভাবতে হযরত আলী (রা) দ্রুত ছুটে গেলেন বাজারের দিকে। কিন্তু বাজারে তখন কোনো দোকানপাট খোলা পাওয়া গেল না। এতে খলিফার হতাশা আরো বেড়ে গেল। চারদিকে অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করছেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ একটা ক্ষীণ আলোর প্রতি তাঁর নজর পড়ল। বাজারের এককোণে জ্বলছিল সে বাতি। খলিফা মনে খানিকটা ভরসা পেলেন। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে, সেখানে হয়তো বা কোনো দোকান খোলা আছে। আর দোকান খোলা পেলে খাবারের ব্যবস্থা একটা তো হবেই।

আলী (রা) তাই দ্রুত এগিয়ে গেলেন বাতিটার দিকে। তাঁর অনুমান সত্যি হলো। গভীর রাতেও একটা দোকান খোলা পাওয়া যাওয়ায় খলিফা নিশ্চিন্ত হলেন। দোকানে যা পেলেন তা নিয়ে খলিফা তড়িঘড়ি বাড়ির দিকে ছুটলেন। তখন গভীর রাত।

মদীনার সর্বত্র তখন চলছিল নিগূঢ় নীরবতা। গোটা শহরজুড়ে জন-মানবের নামগন্ধ নেই। ইতোমধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও কেউ জেগে নেই। খলিফা আলী (রা) মদীনার পথে একাই পথ চলছেন। হাঁটতে হাঁটতে একসময় খলিফা তাঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। ঘরে ঢুকে দেখলেন সবাই তখনো জেগে আছে। ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করছে সবাই। তাই তাড়াহুড়া করে খাবার তৈরি করলেন স্ত্রী ফাতিমা। তারপর সকলে মিলে তৃপ্তিসহকারে খাবার খেলেন। আজকের মতো পেটের ক্ষিধে মিটল। এবার সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত আলী (রা)। দেশের খাদ্যভাণ্ডার ও অর্থসম্পদ সবই তাঁর হাতের মুটোয়। অথচ ঐদিন খলিফা নিজেই মজুরি দিয়ে খাবার জোগাড় করলেন। তিনি পরিবার পরিজনসহ উপোস থাকলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে কিছুই গ্রহণ করলেন না। কী মহান হৃদয়ের মানুষ ছিলেন আমাদের গর্বের এই খলিফা!

আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা মুসলমানরা এমন মহান খলিফাদের উত্তরসূরি। কিন্তু এটাও আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাঁদের মহান চরিত্র ও গুণাবলি অর্জন করতে পারিনি। আমরা মহান খলিফাদের মতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারিনি। তোমরা বড় হয়ে এসব মহামানবের গুণাবলি অর্জন করার চেষ্টা করবে। তা হলেই তোমাদের জীবন হবে সুন্দর।

ব ল তে পা রো ?

১. আলী (রা) একদিন কিভাবে কষ্ট পেলেন?

২. আলী (রা) কোথায় কাজ পেলেন?

৩. আলী (রা) কখন তাঁর কাজ শেষ করলেন?

৪. আলী (রা) পরিবারের লোকজন নিয়ে কখন খাবার খেলেন?

আলী (রা)-এর কাছে প্রশ্ন

একবার ঘটল এক মজার ঘটনা। কোথাও থেকে দশজন লোক হযরত আলী (রা)-এর দরবারে গিয়ে হাজির হলো। তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। লোকেরা জানত হযরত আলী (রা) সে যুগের বিশিষ্ট জ্ঞানী লোক। তাই জ্ঞান সম্পর্কে জানতেই তারা হযরত আলী (রা)-এর কাছে ছুটে গিয়েছিল।

এবার তারা মহামতি খলিফার কাছে প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি চাইল। তারা বলল, 'হে মহামান্য খলিফা! আমরা সবাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করার অনুমতি চাচ্ছি। আপনি দয়া করে আমাদের অনুমতি দিলে প্রশ্ন করতে পারি।' হযরত আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তাই তিনি সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের যাবতীয় প্রশ্ন করতে পারেন।' লোকেরা হযরত আলী (রা)-কে প্রশ্ন করল। তাদের প্রশ্ন ছিল 'জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে কোনটা ভালো এবং কেন ভালো'। তারা আরও বলল, 'আমরা দশজন। তাই অনুগ্রহ করে আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে জবাব দিলে আমরা উপকৃত হবো।'

জবাবে হযরত আলী (রা) লোকদের জন্য নিম্নলিখিত ১০টি উত্তর দিলেন।

১. জ্ঞান হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নীতি। আর সম্পদ হলো ফেরাউনের উত্তরাধিকার। সুতরাং জ্ঞান সম্পদের চেয়ে উত্তম।

২. তোমাকে সম্পদ পাহারা দিতে হয়, আর জ্ঞান তোমাকে পাহারা দেয়। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

৩. একজন সম্পদশালীর শত্রু অনেক থাকে। অথচ একজন জ্ঞানীর অনেক বন্ধু থাকে। অতএব জ্ঞানই উত্তম।

৪. জ্ঞান উত্তম। কারণ, এটা বিতরণে বেড়ে যায়, অথচ সম্পদ বিতরণ করলে কমে যায়।

৫. জ্ঞান উত্তম। কারণ, একজন জ্ঞানী লোক দানশীল হয়, অন্যদিকে সম্পদশালী ব্যক্তি হয় কৃপণ।

৬. জ্ঞান চুরি করা যায় না। কিন্তু সম্পদ চুরি হতে পারে। অতএব, জ্ঞান উত্তম।

৭. সময় জ্ঞানের কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু সম্পদ সময়ের পরিবর্তনে ক্ষয় পেয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

৮. জ্ঞান সীমাহীন। জ্ঞানকে হিসাব করা যায় না বা গণনা করা যায় না। কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং তা গোণা যায়। অতএব জ্ঞান উত্তম।

৯. জ্ঞান উত্তম। কারণ, জ্ঞান মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহকে বলেছেন : আমরা আপনার উপাসনা করি, আমরা আপনারই দাস। অন্যদিকে সম্পদ ফেরাউন ও নমরুদকে বিপদগ্রস্ত করেছে। তারা দাবি করে যে তারাই ইলাহ।

১০. জ্ঞান হৃদয়-মনকে জৌর্তিময় করে, কিন্তু সম্পদ একে মসিলিপ্ত করার মতো। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

আলী (রা)-এর দানশীলতা

হযরত আলী (রা) ছিলেন সহায়-সম্পদহীন একজন আশ্চর্য মানুষ। অভাব-অনটন ছিল তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী। খলিফা হওয়ার পরও দরিদ্রতাকে তিনি পরিহার করতে পারেননি, বরং এতেই ছিল তাঁর আনন্দ। তা না হলে মুসলিম জাহানের অধিপতি হওয়ার পরও পরিবার পরিজন নিয়ে আলী (রা) কিভাবে উপোস থাকতে পেরেছেন? কী অবিশ্বাস্য ঘটনা, তাই না?
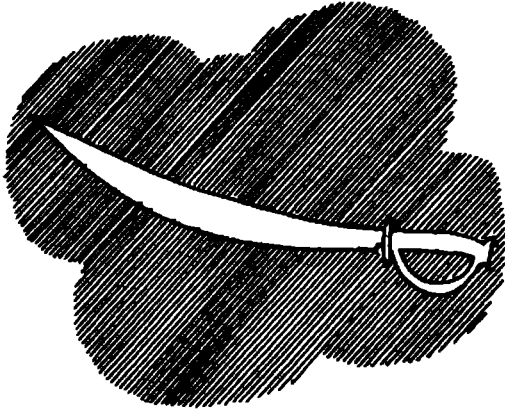
হযরত আলী (রা) দরিদ্র ছিলেন বটে, তবে তাঁর মন ছিল অনেক বড়। তিনি বড় মাপের একজন দানশীল ছিলেন। দানশীলতায় তাঁর সমকক্ষ লোক খুব কম ছিল। কোনো লোক তাঁর কাছে এসে কিছু চাইলে তিনি তাঁকে খালি হাতে ফেরত দেননি। একবার এক ভিক্ষুক এসে আলী (রা)-এর কাছে ভিক্ষা চাইল। তখন তাঁর হাতে সম্বল হিসেবে ছিল মাত্র চার দিরহাম। আলী (রা) আর কিছুই ভাবলেন না। তিনি ভিক্ষুককে তৎক্ষণাৎ দিরহামগুলো দিয়ে দিলেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, আলী (রা) সারাদিন কাজ করে যা কিছু আয় করতেন তার বেশির ভাগই দান করে দিতেন। কোনো কোনো সময় সর্বস্ব

দান করে তিনি ঘরে ফিরতেন। তারপর নিজে পরিবার-পরিজন নিয়ে উপোস থাকতেন। কখনও কখনও পেটে পাথর বেঁধে ক্ষুধার জ্বালা মেটাবার চেষ্টা করতেন। একবার হযরত আলী (রা) কাফেরদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কাফেরদের একজন ছিল বেশ চালাক। সে আলী (রা)-কে পরীক্ষা করার জন্য বলল, 'আপনার তরবারিখানা আমার বেশ পছন্দ। তাই আপনি আমাকে তরবারিখানা দিয়ে দিন। এতে আমি বেশ খুশি হবো।' লোকটার কথা শোনার সাথে সাথে আলী (রা) তরবারিখানা লোকটির হাতে তুলে দিলেন। কাফের লোকটি তরবারি হাতে পেয়ে তো হতবাক। কাফের ব্যক্তিটি ভাবতেই পারেনি যে চাহিবামাত্র আলী (রা) তাকে তরবারিটি দিয়ে দেবেন। তরবারি হাতে পেয়ে কাফের লোকটি মহামতি আলী (রা)-এর উদ্দেশে বলল, 'হে মহামান্য! আপনি একি করলেন। আমি আপনার শত্রু। অথচ আপনার তরবারি আমাকে দিয়ে দিলেন! এখন যদি আমি আপনাকে আক্রমণ করি তা হলে আপনার উপায় কী হবে?'

কাফের লোকটির কথা শুনে আলী (রা) মুচকি হাসলেন। লোকটির প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'তুমি আমার কাছে একটা জিনিস চেয়েছ, আর আমি তোমাকে খালি হাতে ফেরত দেই কিভাবে?'

কাফের ব্যক্তিটি আলী (রা)-এর জবাব শুনে হতবাক হয়ে গেল। মহামতি আলী (রা)-এর মহানুভবতা দেখে বিস্ময়ে লোকটি স্তম্ভিত হলো। এমন মহান মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে কাফের লোকটি নিজেকে ধন্য মনে করল। হযরত আলী (রা) কতটা দানশীল হলে তাঁর শত্রুকেও নিজের শেষ হাতিয়ার তলোয়ার পর্যন্ত দান করে দিতে পারেন! মহামতি আলী (রা)-এর জীবনে দানশীলতার এমন আরও অনেক নজির পাওয়া যায়। আমরা বড় হয়ে তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারব।

ব ল তে পা রো ?

১. একবার ভিক্ষুক আসলে আলী (রা) তাকে কী দিলেন?

২. এক শত্রু আলী (রা)–এর কাছে কী চাইল?

৩. এ গল্প পড়ে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

এক নজরে হযরত আলী (রা)

৬০০ খ্রিষ্টাব্দ : বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমী নামক গোত্রে আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ : কম বয়সে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আলী (রা)। তিনি মাত্র আট বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ : ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে আলী (রা) অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ যুদ্ধে এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেন যে, তাঁর একার হাতেই ২৩ জন কাফের প্রাণ হারায়।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ : মহানবী (সা)-এর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাথে আলী (রা)-এর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ : ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও আলী (রা) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ : হযরত আলী (রা) খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের প্রমাণ দেন।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ : ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়। তিনি সন্ধিপত্রের সম্মানিত লেখক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ : মক্কা বিজিত হয়। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আলী (রা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামের পতাকা হাতে রাসূল (সা)-এর নির্দেশে সসৈন্যে মক্কা নগরে প্রবেশ করেন। একই সালে ঐতিহাসিক হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে কাফেরদের আক্রমণে মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন আলী (রা) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীকে বিজয়ের মালা এনে দেন।

৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ : তাবুক অভিযান পরিচালিত হয়। এতেও আলী (রা) অংশগ্রহণ করেন।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ : বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়। এ হজে আলী (রা) অংশ নেন।

৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ : রাসূল (সা) ইহলোক ত্যাগ করেন। হযরত আলী (রা) মহানবী (সা)-কে নিজ হাতে গোসল করান এবং তাঁর দেহে সুগন্ধি মেখে দেন। রাসুল (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা দান করেন হযরত আলী (রা)। আবু বকর (রা) তাঁর শাসনামলে একটি ফতোয়া পরিষদ গঠন করেন। হযরত আলী (রা) এ পরিষদের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ : হযরত উমর (রা) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পরামর্শদাতা নিয়োগ দান করেন।

৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ : হযরত উসমান (রা) তৃতীয় খলিফা হিসেবে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁকেও সার্বিক সহযোগিতা দান করেন হযরত আলী (রা)।

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ : খলিফা উসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) ইসলামের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন।

৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ : ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদীনায়। হযরত আলী (রা) মদীনা হতে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ইরাকের কুফা নগরীতে স্থানান্তর করেন।

৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ : হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে বিরোধ তৈরী হলে আপস করার জন্য দু'বার মীমাংসা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় 'খারেজী' নামক দলের উদ্ভব হয়।

৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ : ঐতিহাসিক নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ : খারেজী মুলজামের ছুরির আঘাতে আলী (রা) গুরুতর আহত হন। তিনদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

তথ্য কণিকা

১. হযরত আলী (রা) ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২. তাঁর মাতার নাম ফাতিমা। পিতার নাম আবু তালিব।

৩. তিনি আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চাচাত ভাই।

৪. হযরত আলী (রা) মাত্র আট বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন।

৫. তাঁর তিনটি উপাধি ছিল প্রধান। 'আসাদুল্লাহ' মানে আল্লাহর বিজয়ী সিংহ, 'হায়দার' মানে প্রচণ্ড আক্রমণকারী সিংহ, আর 'মুরতাজা' মানে আল্লাহ যার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। তাঁর অন্য একটি উপাধি 'শেরে-এ-খোদা'। এর অর্থ খোদার বাঘ।

৬. তিনি নবীজীর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-কে বিয়ে করেন।

৭. ফাতিমা (রা)-এর দুই পুত্র ছিল। তাঁদের একজনের নাম হযরত হাসান (রা) ও অন্যজনের নাম হযরত হোসেন (রা)।

৮. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যে রাতে হিজরত করেন সে রাতে নবীজীর বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন হযরত আলী (রা)।

০৯. আলী (রা) কৃষিকাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন।

১০. আলী (রা) হযরত উমর (রা)-কে হিজরি সন চালু করার ব্যাপারে পরামর্শ দেন।

১১. আলী (রা) তাবুক অভিযান ছাড়া সবকটি জিহাদে মহানবী (সা)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

১২. বদরের যুদ্ধে প্রথম বিধর্মী ওয়ালিদ হযরত আলী (রা)-এর হাতে নিহত হয়।

১৩. তাবুক অভিযানের সময় নবীজীর পরিবারকে দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন হযরত আলী (রা)।

১৪. আলী (রা) মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর দেহ নিজ হাতে ধৌত করেন এবং তাঁর গায়ে সুগন্ধি মেখে দেন।

১৫. ভয়াবহ ওহোদ যুদ্ধে আট জন অবিশ্বাসী কাফের পতাকাধারী হযরত আলী (রা)-এর হাতে নিহত হয়।

১৬. আলী (রা)-এর খেলাফতের সময়ে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূত্রপাত হয়। এর কয়েকটি হলো, ক। উসমান (রা) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি জোরালো হয়। খ। বনু উমাইয়া এবং বনু হাশিম গোত্রের বিবাদ তীব্রতা লাভ করে। গ। হযরত উসমান (রা)-এর আমলের গভর্ণরদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ঘ। মুয়াবিয়াকে তার ক্ষমতা হতে অপসারিত করেন আলী (রা)। ঙ। আলী (রা) ও নবী পত্নী আয়েশা (রা)-এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চ। আলী (রা)-এর সাথে জুবায়ের ও তালহার বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ছ। আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জ। আলী (রা) ও খারেজীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঝ। আলী (রা)-এর সাথে আকিল ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে।

১৭. ৪০ হিজরি সনে আলী (রা) শাহাদাতবরণ করেন।

১৮. আলী (রা) ইরাকের কুফায় খেলাফতের রাজধানী স্থাপন করেন।

১৯. আলী (রা)-এর সময় গৃহবিবাদে ১,৩০০ মুসলমান শহীদ হন।

২০. আলী (রা) মুয়াবিয়ার স্থলে আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে শামের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

২১. জামালের যুদ্ধে আলী (রা)-এর প্রায় এক হাজার সৈন্য শহীদ হয়। সেই যুদ্ধে আলী (রা)-এর সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০ হাজার।

২২. সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী ও মুয়াবিয়া মুখোমুখি অবতীর্ণ হন। আলী (রা)-এর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯০ হাজার।

২৩. আলী (রা)-এর নামাযে জানাযা পড়ান তদীয় পুত্র হাসান (রা)।

২৪. শাহাদাতবরণের সময় আলী (রা)-এর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

২৫. আলী (রা)-কে বলা হতো 'আসাদুল্লাহ আল গালিব' অর্থাৎ আল্লাহর সিংহ।

২৬. বদর যুদ্ধে মুসলমানদের পতাকা বহন করেন হযরত আলী (রা)।

২৭. হযরত আলী (রা) পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম জেলখানা স্থাপন করেন।

২৮. আলী (রা)-এর তরবারির নাম ছিল 'জুলফিকার'।